টাইমস সগৌরবে ও সবিনয়ে শিরোভূষণ রূপে বহন করে। সেটি হল, এই কাগজে পাওয়া যাবে "All the News that's Fit to Print" — ছাপার যোগ্য যাবতীয় খবর।

এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, ওখস সাহেব ঠিক করেছিলেন, খবর শুধু খবর হলেই তা নিউইয়র্ক টাইমস ছাপবে না। বিচার করে দেখবে খবরটি সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন করা যায় কিনা। খবরটি জানা জরুরী কিনা। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সমকামিতা, যৌনতা, দৈহিক ব্যাপারে এবং এই রকম বিষয়ে কোন খবর নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস মাতামাতি করবে না। কারণ পরিবারের ছেলে মেয়ে যুবক কিশোর বৃদ্ধ মা বোন সবই যখন খাবার টেবিলে জড়ো হন তখন ওই সব বিষয়ে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করা হয় না। পারিবারিক খাবার টেবিলে যে খবর পরিবেশন করা যায় না, সেই খবর তাঁর কাগজে ছাপার যোগ্য নয়, এই ছিল ওখস সাহেবের অনুশাসন।

কিন্তু যুগ বদলায়। সেই সঙ্গে বদলায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, রুচি, ভাল মন্দর বিচারবোধ। অবস্থার চাপে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিযোগিতায় জিততে অনেক আপস করতে হয়, অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। নিউইয়র্ক টাইমসকেও তাই করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার প্রথম পাতার সব চেয়ে ওপরে ছাপা ওই সাতটি শব্দ মুছে দেওয়ার কথা আজও কেউ বলেন না। আজও তার প্রথম পাতার বাঁদিকের কোণে চতুষ্কোণের মধ্যে ছাপা হয়ে চলেছে "ছাপার যোগ্য যাবতীয় সংবাদ"।

২০০২ সালের আগস্ট মাসে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় নীতিতে আরও একটা বড় রকম পরিবর্তন এল। কাগজটির সম্পাদক হাওয়েল্ রেইনস (Howell Raines) ঘোষণা করলেন, তাঁর কাগজে সমকামীদের বিবাহের খবরও প্রকাশিত হবে।

এই বিষয়ে দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলকাতা সংস্করণে ২০-৮-২০০২ তারিখে প্রকাশিত খবরের কিছুটা অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি—

New York Times to publish gay, lesbian unions

New York: The New York Times, one of the most respected newspapers in the US, said on Sunday it was changing its policy to publish formal gay and lesbian unions, joining scores of other dailies.

Editor Howell Raines said in Sunday's editions the change to "Wedding/Celebrations" from "Weddings" in the long-running Sunday Styles section will begin next month.

Gay and lesbian activists hailed the move.

"We are delighted that The New York Times has changed its policy because it is in many ways the preeminent newspaper in this country," said a spokesman of the Gay & Lesbian Alliance.

Until Sunday, The New York Times had a written policy not to include same-sex unions.

"In making this change we acknowledge the newsworthiness of a growing and visible trend in society toward public celebrations of commitment by gay and lesbian couples," Rains said.

নিউইয়র্ক টাইমসের জনক ওখসসাহেবের বিচারে যা ছিল অশিষ্ট, অশালীন, অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় তেমন খবরাখবর শুধু আমেরিকা বা ইউরোপের খবরের কাগজগুলিতে ছাপা হয় না, কলকাতার কয়েকটি কাগজেও ওই রকম খবর স্থান পাচ্ছে। যেমন—

কাগজ গ, ১২-৬-২০০২, "Sex No Bar As Money Tops Teen Priority."

কাগজ ঝ, ৩০-৬-২০০২, "Should Homosexuality be legalised?"

কাগজ ক, ৩০-৬-২০০২, "শিক্ষকের যৌন পীড়নের শিকার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আত্মঘাতী।"

কাগজ ঙ, ২-৭-২০০২, "NY gay parade sees wigs and weddings."

এই চারটি খবর কী পাঠকদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ? পরিবারের বড়রা ছোটদের সঙ্গে, ছোটরা বড়দের সঙ্গে কি দ্বিতীয় খবরটি নিয়ে নিঃসংকোচে বিতর্ক করতে পারে? আলোচনা করতে পারে? আপনার ভাই বা বোন কি আপনাকে বলতে পারে, সমকামিতা আইনসিদ্ধ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে বিতর্ক করা কি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের পরিচয়?

প্রথম খবরটির বিষয়বস্তু হল, স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা হাত খরচ জোগাড় করার জন্য যৌন ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তাই হয়ত পড়ছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কতজন? খুব কম বললেও বেশি বলা হয়। তাহল এটা নিয়ে খবর করা কেন? পাঠকদের কাছে কী বার্তা পাঠাচ্ছে এই খবর? স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের কোন পথের ঠিকানা দিচ্ছে এই সংবাদ? কাদের কাছে এই খবর এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?

তৃতীয় খবরটি মারাত্মক। শিরোনামের সঙ্গে খবরের বিস্তর গরমিল। শিরোনামে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষকের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন কী অপরাধী শিক্ষকের নামও খবরে লেখা হয়েছে।

যে শিক্ষকের যে দোষ প্রমাণ হল না তাঁর মাথায় সেই অপরাধের বোঝা এই খবরে চাপিয়ে দেওয়া হল। একটি কিশোরকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্যও প্রকারান্তরে দায়ী কর হল তাঁকে। একে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা বলা চলে না। বরং একে পীত সাংবাদিকতার (Yellow Journalism)-এর একটি দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করা যায়।

খবরে জানা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে অভিযোগ ওঠার পর থেকে ওই শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমরা ওই শিক্ষককে পীত সাংবাদিকতার নির্যাতনের শিকার বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই রকম খবর প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা সম্পাদকের পদমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না। পর্নোগ্রাফির (Pornography) সঙ্গে খবরের কাগজের তফাত সম্পর্কে সজাগ থাকা সম্পাদকেরই দায়িত্ব। পর্নোগ্রাফিকে সম্পাদক কোন অজুহাতেই খবরের মর্যাদা দিতে পারেন না।

নিউইয়র্ক শহরে সমকামীদের বর্ণাঢ্য মিছিল চতুর্থ খবরটির বিষয়বস্তু। এই রকম খবরের তৃষ্ণায় এখানকার পাঠকদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে এমনটা ধরে নেওয়ার কোন কারণ আছে কি? নেই।

এই খবরটি চোখে পড়ার পর আপনার ভাই বা বোন যদি জানতে চায়, কাদের বলে, আপনি পারবেন তাকে খোলা মনে বুঝিয়ে দিতে? নিশ্চয় পারবেন না। তাহলে কিসের জন্য এই খবর? কার জন্য এই খবর? সম্পাদককেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

এই সুযোগে আমরা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জানা দরকার।

১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ সহযোগী সম্পাদক রূপে ওই কাগজে যোগ দেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন। এক বছরের মধ্যেই তিনি আনন্দবাজারের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে আনন্দবাজারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলে তিনি যুগান্তরে আসেন। কিন্তু যুগান্তরের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন টেঁকেনি। 'অরণি', 'স্বরাজ', 'সত্যযুগ' হয়ে ১৯৫১ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিল, "বাংলার সংবাদপত্র জগৎ এই অসীম শক্তিমান লেখকের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৫৪)।

তাঁর সম্পর্কে এই নিবন্ধে বলা হয়েছিল, "সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ, তীক্ষ্ণধী শক্তিমান লেখক। সংবাদপত্র জগতে এইরূপ সব্যসাচীসদৃশ শক্তিমান লেখক আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। যে কোনো বিষয় লইয়াই তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে কোন বিষয় লইয়াই তিনি অনবদ্য বলিষ্ঠ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার সংবাদপত্র-সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে তাহর তুলনা নাই।"

খবরের কাগজ ও তার সম্পাদককে সত্যেন্দ্রনাথ কি চোখে দেখতেন? এই প্রশ্নের জবাব মিলবে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে। ১৯৩৮ সালে কৃষ্ণনগরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় ছিল সংবাদ-সাহিত্য।

ভাষণে সংবাদপত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক আর যৌথ কারবারই হউক, সংবাদপত্রের আসল প্রভু জননায়ক, জনতা মহারাজ, গভর্নমেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতা। ইহাদের পরস্পরের বিপরীত স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের ঘাত-সংঘাত সংবাদপত্রের উপর সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে।"

সংবাদপত্রের চরিত্র এত কম কথায় কিন্তু এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার মধ্যে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর চিন্তাশক্তির একটু পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের মালিক একই সঙ্গে চান দেশের নেতাদের ভালবাসা, দেশের মানুষদের বিশ্বাস, সরকারের আস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা।

যে কাগজের প্রতি নেতা প্রসন্ন থাকেন সেই কাগজের মর্যাদা তত বাড়ে। কিন্তু নেতা ও জনতাদের স্বার্থের সংঘাত হলে মালিক সংকটে পড়েন। নেতা ও জনতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে সরকার রুষ্ট হয় এমন কিছু লিখে ফেলার ঝুঁকি কর্তৃপক্ষ চট করে নিতে চান না। তার ওপর রয়েছে বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ। তার মেজাজ বিগড়ে গেলে কাগজের অর্থভাণ্ডারে টান পড়ে যাবে। কোন কর্তৃপক্ষই কী সাধ করে তা চাইবেন? কেউ না। তাহলে সম্পাদক কী করবেন? কোন দিকে যাবেন?

এইসব কথা ভেবেচিন্তে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কৃষ্ণনগরে ভাষণে বলেছিলেন, "সম্পাদককে এই সব চাপ, পাল্টা চাপ, স্রোত, চোরা স্রোত স্বীকার, অস্বীকার, উপেক্ষা, ক্ষমা করিয়াই দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়।"

তাঁর এই ভাষণের আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। তাই জানাই, তিনি আরও বলেছিলেন, "সম্পাদকের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে সংবাদপত্র পরিচালিত হয় না, অথচ প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা ও অপবাদের ভাগ সম্পাদকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। সম্পাদক অতি মানব নহেন। দোষত্রুটি অপূর্ণতা যেমন সাধারণ

মানুষের আছে, তেমনি সম্পাদকেরও আছে। কিন্তু তাহা স্মরণ রাখিয়া কেহ তাহাকে রেহাই দেয় না। সম্পাদককে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে, সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; সামান্য অসাবধান হইলেই আইন তাহাকে দংশন করিবে। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইতে অস্বীকার করিলে ক্রুদ্ধ হন, নেতারা তাঁহাদের বিবৃতি বড় বড় হরফের শিরোনামা দিয়া প্রকাশ না করিলে বিষণ্ণ হন, মন্ত্রীদের দোষত্রুটি উদ্ঘাটন করিলে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বড় বড় ডাণ্ডা বাহির করেন, পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্ন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপর প্রাত্যহিক কটাক্ষ ও সমালোচনা দেখিয়া দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ করেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদকদের অবস্থার এই বিশ্লেষণ আজও বহুলাংশে বহাল রয়েছে কি না তা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তো অনেক পরে এলেন। তারও আগে মঞ্চ আলো করে আবির্ভূত হয়েছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ। শিশিরকুমার আর মতিলাল দুই ভাই মিলে যশোর জেলার একটি গ্রাম থেকে হঠাৎ একটি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বার করে ফেললেন। পত্রিকাটির নাম দিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদক শিশিরকুমার বিদেশি রাজের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাতে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন শিশিরকুমার। তা হল, সরকার ও তার হুকুম বরদারদের 'প্রকৃত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল উদ্ঘাটিত' করা। কারণ, বিদেশ থেকে মানদণ্ড হাতে করে এ দেশে প্রবেশ করে তার রাজদণ্ড হাতে তুলে নেওয়ার 'কঠিন ও ক্লান্তিকর দায় থেকে দেশের মানুষকে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরই স্বার্থে ও কল্যাণে নিজেরা সেই' গুরুভার বোঝা বইছেন। 'সদাশয় সরকার' ও তার আমলাদের সেই 'মহানুভবতার প্রতিদান' দেওয়াই অমৃতবাজারের ব্রত। অমৃতবাজার নিরন্তর সরকার ও প্রশাসনের মুখোশ খুলে দিয়ে সেই কাজ করবে।

শিশিরকুমার ও মতিলাল সততা, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে তাঁদের ব্রত পালন করেছিলেন। শিশিরকুমার এক সময়ে তাঁর কাগজকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই ক্যামেরায় যদি অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বাস্তবতা ফুটে ওঠে তাহলে তিনি নাচার।"

সোজা কথায়, ওই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শিশিরকুমার ও মতিলাল তাঁদের সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি ঘোষণা করে দিলেন। সেই নীতির সারমর্ম হল, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা নিরপেক্ষ নন। তাঁদের পক্ষপাতিত্ব নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত দেশবাসীর পক্ষে। বিদেশি শোষকদের বিরুদ্ধেই তাঁরা কলম চালাবেন।

এই দুঃসাহসিক নীতির জন্য তাঁরা একই সঙ্গে রাজশক্তির মনে সম্ভ্রম ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তাঁরা প্রথমে লোভ দেখিয়ে ঘোষভ্রাতাদের বশ করার চেষ্টা করল। সেই কাজে সরাসরি উদ্যোগ ছিল বাংলার লাটসাহেব স্যার অ্যাশলি ইডেনের। কিন্তু লাটসাহেবের দেওয়া ক্ষমতার উপঢৌকন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন শিশিরকুমার।

অপমানিত লাটসাহেব তাতে চটলেন। এবার তিনি চেষ্টা করলেন আইনের ফাঁস দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার। সেই মতলবে ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদন করানো হল একটি কালা আইন। তার নাম ছিল Vernacular Press Act — দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলির কলমে আইনের লাগাম পরানো। ভারতীয়

জনসাধারণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার জন্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলিতে রাজদ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করতে এই আইন রচনা করা হয়েছিল।

আইনের কায়দাকানুন দেখে বুদ্ধিমান ঘোষভ্রাতাদের বুঝতে দেরি হল না যে এই দমনমূলক আইনের আসল লক্ষ্য ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক কাগজ অমৃতবাজার পত্রিকা। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে যে কোন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক কাগজকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়েছিল।

ঘোষভ্রাতারা আইনের লক্ষ্য বুঝলেন কিন্তু ভয় পেলেন না। সাগরপারের প্রভুরা চলেন ডালে ডালে, ভেতো বাঙালি সম্পাদক চলেন পাতায় পাতায়। আইন পাস হবার সাতদিন পরে ২১ মার্চ অমৃতবাজারের নতুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। সেটি হাতে নিয়ে আইনের জনক ও রক্ষাকর্তাদের চোখ চড়কগাছে উঠল। তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, অমৃতবাজারের সেই সংখ্যাটি আগাগোড়া ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। ইংরেজি ভাষা ভারতের দেশি ভাষা নয়, বিদেশি ভাষা। অমৃতবাজারকে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সাতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষায় প্রকাশ করে অ্যাশলিসাহেবের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোয় পরিণত করে দিলেন শিশিরকুমার-মতিলাল জুটি।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের দুঃসাহসী কীর্তিকলাপ জানার পাশাপাশি যুগান্তরের এক ডাকসাইটে সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও আপনাদের কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। তিরিশের দশকে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যুগান্তর নামে একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ বার করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বিবেকানন্দ যুগান্তরের সম্পাদকপদে যোগ দেন। পরে তিনি একটানা ২৫ বছর ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখার ধারে ও ভারে রাজশক্তি মাঝে মাঝেই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হত। আনন্দবাজারে একবার 'সাহিত্যে সরকারি দৌরাত্ম্য' শিরোনামে তাঁর লেখা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়ে। তার সাজা হিসাবে সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল।

চল্লিশের দশকে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু দুর্গত মানুষদের ত্রাণ সাহায্য করতে বিদেশি সরকার কার্পণ্য ও ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই দেখায়নি। সরকারের এই অমানবিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের কলমের মুখে তুফান ছোটে। রচিত হয় এক ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ, 'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি'। ব্রিটিশ সরকার বদলা নিতে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে একটানা তিন দিন যুগান্তরের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের মেয়ে এষা দে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, "'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি'র ক্লিপিং কলকাতার কলেজে কলেজে উৎসাহী ব্যক্তিরা সেঁটে দিয়েছিলেন। এইরকম মারমুখী সম্পাদকীয় লেখায় সেদিন বাঙ্গালীজাতির চোখে বাবার যে গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতে মালিক পক্ষ সম্পূর্ণ ভাগীদার ছিলেন। অর্থাৎ রাজরোষ ও ব্যবসায়ে লোকসানের চেয়ে নির্ভীক, বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শই যে বড় তা দু পক্ষই সমানভাবে বিশ্বাস করতেন" (শারদীয় আজকাল, ১৪০৮)।

কিন্তু সম্পাদক-মালিক মধুযামিনীর মিষ্টতা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পানসে হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের পদ হারালেন। তারও দশ বছর পরে ক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে সখেদে লিখলেন, "খবরের কাগজে সম্পাদক হিসাবে যার নাম ঘোষিত হয়ে থাকে, নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর কিছুটা সম্মান ও কিছুটা

স্বাধিকার থাকে। পাছে সেই সম্মানটুকু এবং সেই স্বাধিকারের সুযোগ নিয়ে সম্পাদক মশাই কখনও কখনও এমন কিছু লিখে বসেন, যাতে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গায়ে আঁচড়টুকু লাগতে পারে কিংবা কোন কোন দিক দিয়ে মালিকপক্ষের স্বার্থের উপর কিছুটা আঘাত পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় গত দুই দশক ধরে সংবাদপত্রের মালিকেরা একটা সোজা পথ অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই সম্পাদকের আসন দখল করে নিয়েছেন।"

আরও পরে ১৯৮৩ সালে প্রেস ক্লাব, ক্যালকাটার বিশেষ সংখ্যায় বিবেকানন্দ আরও চাঁচাছোলায় ভাষায় অনুযোগ করেছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে "সংবাদপত্রে সম্পাদকের বা সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন ঘটেছে।"

বিবেকানন্দের এই সব বক্তব্য অনেকাংশে সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়ে থাকে। কোন কোন সাংবাদিক মনে করেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন, মালিক সম্পাদক মানেই অযোগ্য সম্পাদক, সব ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিযোগিতার যুগে পেশাদারী দক্ষতাহীন অযোগ্য সম্পাদক অচল। সুতরাং উপযুক্ত সাংবাদিক নিয়োগ করে তাঁদের সাহচর্যে মালিককেও সম্পাদক হিসাবে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেই হয়। মালিক-সম্পাদক যদি সে দিকে নজর না দিয়ে শুধুই ছড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর খবরের কাগজের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে বেশি সময় লাগার কথা নয়।

সম্পাদকের কথা এবার শেষ হবে। শেষের শুরু হিসাবে আরও গুটি কয়েক প্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই।

মূলত কলকাতা এবং মুম্বাইয়ে এক ডজন দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রতাপ কুমার। তা ছাড়া টাইমস অব ইন্ডিয়া, অমৃতবাজার পত্রিকাসহ আরও চারটি কাগজের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা খবরের কাগজের উৎপত্তি, বিনাশ এবং সেই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবার জন্যই এখানে প্রতাপকুমারকে টেনে আনা হল। সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় 'পদ্মপত্রে জলবিন্দু' নামে একটি ধারাবাহিক রচনায় (৩-৮-২০০২) প্রতাপকুমার জানিয়েছেন :

যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে বাংলায় ভারত এবং ইংরেজিতে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস নামে দুটি দৈনিক কাগজ বেরত। ভারত কাগজের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল মাখললাল সেনের। বাজারে তাঁর এমনই দাপট যে মানুষ বিশ্বাস করে আনন্দবাজার পত্রিকা তিনিই গড়েছিলেন।

মাখনলালের কাগজ চালাবার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু অর্থ ছিল না। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল রামনাথ গোয়েঙ্কার। রামনাথ দক্ষিণ ভারতে কাগজ চালাতেন। পরে বোম্বেতেও কাগজ বার করেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পর তিনি পূর্ব ভারতে পা রাখলেন কলকাতায়। সেই সূত্রে মাখনলালের সঙ্গে যোগাযোগ হতে দেরি হলনা।

কিন্তু লোকসানের অঙ্ক বাড়তে থাকায় মাখনলাল-রামনাথ জুটি কলকাতা জয় করার আগেই ভেঙে গেল। এই সংকটকালে আর একজন মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে মাখনলালের হাত ধরলেন। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ ডালমিয়া।

দেশ স্বাধীন হবার পর বোম্বের প্রাচীন ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া (প্রবীণ মানুষরা আদর করে বলেন Old Lady of Buri Bunder) ইংরেজ মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেন রামকৃষ্ণ। তাঁর সিন্দুকে তখন অঢেল টাকা। এ হেন ডালমিয়া ভারত বাঁচাতে মাখনলালের অংশীদার হলেন। তখন সার্কুলার রোডের ওপর সুরি লেনে ভারতের অফিস।

নতুন ব্যবস্থায় প্রতাপকুমারকে ভারতের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন শেঠজি। কিন্তু প্রতাপকুমার কাজ করতে গিয়ে মাখনলালের সহযোগিতা পেলেন না। ফলে শেঠজির নির্দেশে একদিন নোটিশ দিয়ে ভারত বন্ধ করে দেওয়া হল।

অদম্য শেঠজি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দমলেন না। তিনি কলকাতা থেকে বাংলা হিন্দি ও ইংরেজি কাগজ বার করবেন। তার সফল ব্যবস্থাপনার ভার দিলেন প্রতাপকুমারকে। কনভেন্ট রোডে ল্যাজারাস কোম্পানির প্রকাণ্ড কাঠের কারখানা এবং সংলগ্ন খালি জমিতে অফিস করে কাগজ বার করার আয়োজন চলতে লাগল। ফ্রান্স থেকে কেনা রোটারি যন্ত্রে ভারত ছাপা হত। সুরি লেন থেকে সেই মেশিন খুলে আনা হল কনভেন্ট রোডের অফিসে।

কাগজের সম্পাদক হবার জন্য উদ্যোক্তারা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডাকলেন। তিনি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। তাঁরই পরামর্শে বার্তা সম্পাদক হলেন সুকুমার মিত্র।

প্রতাপকুমারের ওই বর্ণনা থেকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের কাঠামো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা একটু স্বচ্ছ হল বলে ধরে নিচ্ছি।

সাপ্তাহিক বর্তমানের ১০-৮-২০০২ তারিখের সংখ্যায় প্রতাপকুমারের লেখা থেকে আরও জানা গেল। নতুন বাংলা কাগজটির নামকরণ নিয়ে জল কিছুটা ঘোলা হয়েছিল। শেঠজির প্রস্তাব, কাগজের নাম হোক ধর্মযুগ। প্রতাপকুমার প্রতিবাদ করলেন। তখন শেঠজির প্রস্তাব, তপযুগ। সে প্রস্তাবও টিঁকল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সত্যযুগ। সত্যযুগে অন্যদের সঙ্গে এলেন গৌরকিশোর ঘোষ আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নীরেন্দ্রনাথ আগে অন্য বাংলা কাগজে একই কাজ করেছেন। আর এলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সবাই সাহিত্যিক।

নীরেন্দ্রনাথের বাড়তি দায়িত্ব রবিবারের সাময়িকী সম্পাদনা। তিনি সে কাজ আগে করেননি। তাই হয়ত সাময়িকী সম্পাদনার প্রচলিত ধারা তাঁকে বন্দী করতে পারেনি।

কাগজে ছোটদের পাতা এবং সিনেমা থিয়েটারের পাতাও ছিল। ওই পাতা দুটি সম্পাদনার ভার পেলেন গৌরকিশোর। তাঁর ব্যতিক্রমী জন এবং রসবোধ এই পাতাদুটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ? প্রতাপকুমার জানাচ্ছেন, "সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপরে চারটের সময় অফিসে আসতেন। রাত নটা অব্দি তাঁকে অফিসে পাওয়া যেত। তিনি তখন দিগ্বিজয়ী সম্পাদকীয় লেখক। তাঁর অলঙ্কারবহুল ধ্বনি, মাধুর্যমণ্ডিত লেখা সহজেই পাঠকদের আকৃষ্ট করত। তখনও দেখেছি, পরে আরও নানা স্থানেও দেখেছি বড় সম্পাদকেরা নিজেদের লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কাগজে আর কী হচ্ছে, সব মিলিয়ে কাগজের কেমন রূপ হল তা নিয়ে খুব মাথা ঘামাতেন না।"

৫.২.৩ নির্বাহী সম্পাদক

খবরের কাগজের নির্বাহী সম্পাদককে সম্পাদকের সমতুল্য পদাধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তিনি সম্পাদক নন। অথচ সম্পাদকের বকলমে তিনিই সম্পাদকীয় দপ্তর পরিচালনা করেন। তবে নির্বাহী সম্পাদকের রাশ থাকে সম্পাদকের হাতে।

এই কারণে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, "Executive Editor means a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor etc." — অর্থাৎ, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় দফতরের কাঠামোয় সম্পাদকের পরেই নির্বাহী সম্পাদকের স্থান।

নির্বাহী সম্পাদকের গুণাবলী এবং কাজকর্ম সম্পর্কে আরও কিছু জানতে গেলে বেন ব্রাডলি এবং অ্যাব রোসেনথাল সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা জানান দরকার। প্রথমে আমরা বেন ব্রাডলি সম্পর্কে জানব। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে The Washington Post — দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর পর থেকে আমরা বেন ব্রাডলিকে শুধু বেন এবং দ্য ওয়াশিংটন পোস্টকে শুধু পোস্ট বলে উল্লেখ করব।

পোস্টের প্রতিষ্ঠা ১৮৭৭ সালে। এখন আমেরিকার কংগ্রেস সদস্য ও সেনেটারদের দিনের পাঠ্য বস্তুটি হল পোস্ট। পোস্টের পাতায় চোখ বুলিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির দিনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পোস্ট বরাবর এত প্রভাবশালী ও সফল খবরের কাগজ ছিল না। ১৯৩৩ সালে লোকসানের বোঝা বইতে বইতে কাগজটি লাটে ওঠে। দেউলিয়া পোস্টের বিষয়সম্পত্তি বেচে দেনাদারদের পাওনা মেটান ছাড়া আর উপায় রইল না। কাগজের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠল অনিশ্চিত।

এই দুঃসময়ে পোস্টকে পুনর্জীবন দিতে নিলাম ঘরে হাজির হলেন মেয়ার (Mayer) দম্পতি। ইউজিন এবং অ্যাসনেস মেয়ার আট লাখ ২৫ হাজার ডলার মূল্য গুণে দিয়ে পোস্টের মালিকানা কিনে নিয়ে কাগজ চালু রাখলেন। কিন্তু তাঁরা কাগজের টাকাকড়ির দিকটা সামলে উঠতে পারলেন না। পোস্টের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আগে যেমন টালমাটাল ছিল পরেও তাই থেকে গেল। তখন মেয়ার দম্পতি পোস্টের হাল তুলে দিলেন তাঁদের কন্যা ক্যাথরিনের স্বামী ফিলিপ গ্রেহামের হাতে। মেয়ারদের জামাতাকে আমরা এরপর থেকে ফিল বলেই উল্লেখ করব।

পোস্টকে ফিল পোক্ত বনেদের ওপর দাঁড় করাতে সফল হলেন। কিন্তু নিজের তৈরি সাম্রাজ্য ভোগ করার জন্য তিনি নিজেই বেশি দিন টিঁকলেন না। Robin Webb — রবিন ওয়েব নামে এক মহিলা কর্মচারীর সঙ্গে ফিল অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক এমন মাত্রায় পৌঁছল যে শোনা যেতে লাগল স্ত্রী ক্যাথরিনের সঙ্গে তিনি দাম্পত্য সম্পর্কে চুকিয়ে বুকিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করবেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সফল সংবাদপত্র পরিচালক ফিলের জীবনে ব্যর্থতার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল অন্যদিক থেকে। দেখা গেল তিনি প্রচণ্ড মাত্রায় মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর আচার-ব্যবহার ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠল। মানসিক অবসাদ ধীরে ধীরে গ্রাস করল পোস্টের অভিভাবক ফিলকে।

কিন্তু যোগ্য বাপের যোগ্য মেয়ে ক্যাথরিন পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ফিলকে চিকিৎসা করিয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ করে তুললেন। তবে সেই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হল না। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি নিজের ডানদিকের রগে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

ফিল আত্মহত্যা করার পর পোস্ট পরিচালনার দায়িত্ব চলে গেল ক্যাথরিনের হাতে। তাঁর পরিচালনার গুণে পোস্ট বেঁচে গেল। কাগজ চলতে লাগল ভালভাবেই। কিন্তু তাতে ক্যাথরিনের মন ভরল না। পোস্ট কি করলে আরও, আরও, আরও ভাল চলে সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপার খেতে লাগল। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল, একজন নতুন চৌখস সম্পাদক চাই। কে হতে পারে তাঁর সেই স্বপ্নের সম্পাদক? এই ভাবনার মধ্যেই তাঁর একদিন Benjamin Crowninshielf Bradlee — বেন ব্রাডলির কথা মনে ভেসে উঠল। ব্রাডলি তখন 'Newsweek'-এর ওয়াশিংটন ব্যুরোর প্রধান। ক্যাথরিন তাঁর সম্পর্কে নানা দিক দিয়ে খোঁজখবর নিলেন। তাতে তাঁর মনে হল, তিনি যে পরশ পাথরটি খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেছেন। তবু পা ফেলার আগে আরও দুজন প্রবীণ, বিচক্ষণ ও নিঃস্বার্থ সাংবাদিকের সঙ্গে বেন-এর ব্যাপারে কথা বললেন। তাঁরা হলেন স্তম্ভ লেখক ওয়াল্টার লিপম্যান এবং জেমস রেস্টন। তাঁরা উভয়েই বেন-এর প্রশংসা করে বললেন, ক্যাথরিন যেমনটি চাইছেন তেমনটি করার উপযুক্ত লোক বেন।

অতএব আর দেরি না করে ক্যাথরিন সিদ্ধান্ত নিলেন বেনকে তিনি পোস্টে আনছেন। কিন্তু প্রথমেই তো তাঁকে সবার মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই তাঁকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটর পদে নিয়োগ করা হল। ক্রমশ তিনি পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হয়েছিলেন।

নির্বাহী সম্পাদক হবার পর বেন তাঁর সহকর্মীদের অল্প কয়েকটি কথায় তাঁর লক্ষ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "I want to have impact on this town. I want to know that they are reading us." — অর্থাৎ ওয়াশিংটন শহরের ওপর আমি পোস্টের প্রভাব বিস্তার করতে চাই। আমি জানতে চাই, ওয়াশিংটনবাসীরা পোস্ট পড়ছে।

ক্যাথরিনও ঠিক তাই চাইছিলেন। অতএব বেন পোস্টের খবরের খাসমহলে প্রভুত্ব করতে লাগলেন। তা করার জন্য তিনি বেশ সকাল সকাল পোস্টের দফতরে এসে কাজে হাত দিতেন। বাড়ি ফিরতেন কাগজের শহর সংস্করণ প্রেস থেকে বের হবার পর। আবার বেলা না গড়াতেই দফতরখানায় দেখা যেত বেনকে। অফিসে তিনি মাঝেমাঝেই রিপোর্টার এবং সাব-এডিটরদের মহল্লায় টহলদারি করতেন।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, কোন (নির্বাহী) সম্পাদক ধাড়ি ঈগল, কেউ ছুঁচো, আর কেউ বা ধূর্ত চটপটে শেয়াল। আমাদের বেনসাহেব সেটাই। ধূর্ত শেয়াল বেন ব্রাডলির জমানায় পোস্টে প্রকাশিত একটি খবর আমেরিকাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই খবরটির শিরোনাম ছিল 'জিমির জগৎ'। আর একটি খবর দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার বিষয়বস্তু ছিল 'ওয়াটারগেটের কেলেঙ্কারি'।

রিপোর্টারদের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে আপনারা ওই দুটি বিশেষ খবর সম্পর্কে আরও কিছু কথা জানতে পারবেন।

ব্রাডলি যখন পোস্টে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছেন সেই সময়ে নিউইয়র্ক টাইমসে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক এ এস রোসেনথাল। তিনি যখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার ছিলেন তখন তাঁর নামাঙ্কিত রিপোর্টে ওই নামই ছাপা হত। তাঁর পুরো নাম ছিল আব্রাহাম মাইকেল রোসেনথাল।

রিপোর্টার থেকে তিনি ধাপে ধাপে নির্বাহী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই পদ অর্জন করতে হয়েছিল।

রিপোর্টার হিসাবে তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন। কলেজের ছাত্র থাকার সময়ে তিনি সাংবাদিকতা আরম্ভ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন কলেজ ক্যাম্পাসের খুচরো খবর যোগানদার আংশিক সময়ের এক তুচ্ছ রিপোর্টার। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও সার আছে। ফলে তিনি শীঘ্রই নিউইয়র্ক টাইমসে পাকা চাকরিতে বহাল হলেন। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর। আঁদ্রে গ্রোমিকো তখন রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রসংঘ দফতরে গ্রোমিকোর চালচলন অবলম্বনে একটি ফিচার লিখে ওপরওয়ালাদের নজর কাড়লেন অ্যাব। ফলে পদোন্নতি হল তাঁর। এবার তিনি রাষ্ট্রসংঘে নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টারের পদে নিযুক্ত হলেন। এই কাজে তাঁর প্রতিভা আরও বিকশিত হল। তা দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বৈদেশিক সংবাদদাতার পদ দিলেন। প্রথম কর্মস্থল দিল্লি। দিল্লি থেকে ওয়ারশ। ওয়ারশ থেকে টোকিও।

বেন ব্রাডলির লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটন শহর পোস্টের মুঠোয় আনা। ওদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, নিউইয়র্ক শহরে অন্য কোন কাগজকে মাথা তুলতে দেওয়া হবেনা। তার জন্য দরকার কাগজের মেট্রোপলিটান বা মেট্রো বিভাগের স্থবিরতা কাটিয়ে আরও ঝকঝকে টগবগে চনমনে করে তোলা। সেই দায়িত্ব দিয়ে অ্যাবকে টোকিও থেকে টেনে আনা হল নিউইয়র্কে।

মেট্রোর দায়িত্ব নিয়ে অ্যাব সেই বিভাগে দুরমুশ পিটতে আরম্ভ করলেন। তরুণ রিপোর্টারদের চাঙ্গা করে তাদের ভাল ভাল খবর আনার দৌড়ে নামিয়ে দিলেন। ডেস্কের মাহাত্ম্য কমিয়ে সাব-এডিটরদের কোণঠাসা করে দিলেন। ছোকরা রিপোর্টারদের কাজপাগল করে তুলতে তিনি মোটা হারে মাইনে বাড়াবার এবং রিপোর্টে তাদের নামাঙ্কনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। এই কড়া দাওয়াইয়ে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গেল। কিন্তু প্রবীণ রিপোর্টার এবং কোণঠাসা সাব-এডিটররা ঘোঁট পাকিয়ে অ্যাবের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কান ভাঙ্গাবার অভিযানে নেমে গেল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। কারণ, কর্তৃপক্ষ ততদিনে টের পেয়েছেন, অ্যাব পরিচালিত মেট্রো নিউইয়র্কবাসীদের মন ভোলাতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মেট্রো বিভাগে অ্যাবের দাপট অক্ষুণ্ণ রইল।

সত্তরের দশকে অ্যাবকে কাগজের ম্যানেজিং এডিটরের পদে বসান হয়। সেই পদে থাকার সময়ে তিনি নিজের পেশাগত জীবনের এবং নিউইয়র্ক টাইমসের জীবনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। বিষয় ছিল 'পেন্টাগন পেপার্স'। ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন ফৌজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের গোপন প্রমাণপত্র ছিল 'পেন্টাগন পেপার্স'-এ। তা নিউইয়র্ক টাইমসের হস্তগত হয়। সম্পাদকীয় বিভাগের ওপরতলায় ওই রিপোর্ট ছাপা হবে কিনা তা নিয়ে জোর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এক পক্ষের মত ছিল, এই রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমস ফাঁস করলে নানা দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। তাই ওই রিপোর্ট চেপে যাওয়া হোক।

অন্য পক্ষের মত ছিল, এই রিপোর্ট চেপে গেলে তা কাগজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা তথা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে ১৯৭১ সালের ১৩ জুন 'The Mcnamara Papers' শিরোনামে ভিয়েতনামে পেন্টাগনের সরাসরি যুদ্ধের গোপন প্রমাণ ফাঁস হয়ে গেল।

পরের পাঁচ বছর নিউইয়র্ক টাইমস অ্যাবের সম্পাদনায় অনেক বড় বড় খবর ফাঁস করল বটে কিন্তু কাগজের আর্থিক অবস্থায় মন্দার ভাব প্রকট হয়ে উঠল। কাগজের খরচ বাড়ছে, রোজগারও বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় মুনাফার হার বাড়ছে না। কাগজ বিক্রি বাড়ছে না। বিজ্ঞাপন থেকে আয়ও বাড়ছে না। বাড়ছে শুধু খরচ। এই অবস্থা চলতে দিলে লোকসানের ধাক্কা আসতে দেরি হবে না। লোকসান সামাল দিতে জোর

করে খরচ কমালে কাগজের মান পড়তে থাকবে। নিম্ন মানের নিউইয়র্ক টাইমস-এর পায়ের তলা থেকে জমি সরতে শুরু করবে।

দিগন্তে সেই দুর্দিনের মেঘ ঘনাতে দেখে কাগজের মালিক পাঞ্চ স্যুলজবার্গারের (Punch Sulrberger) মন ভারি হয়ে উঠল। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অ্যাব রোসেনথাল এবং রবিবারের সাময়িকীর সম্পাদক ম্যাক্স ফ্রাবেকলের কাছ থেকে পরিকল্পনা চাইলেন। দুজনের কারো কাছেই পাঞ্চ মনের কথা ভাঙলেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন দুজনের মধ্যে যা পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে তাঁকেই পরবর্তী নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত করবেন।

এই প্রতিযোগিতায় অ্যাবই জিতলেন। পুরস্কার পেলেন নিউইয়র্ক টাইমসের নির্বাহী সম্পাদকের পদ। তাঁর দক্ষ পরিচালনার গুণে নিউইয়র্ক টাইমস ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল।

১৯৮৬ সালে পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক বেন ব্রাডলি এবং নিউইয়র্ক টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক অ্যাব রোসেনথাল উভয়েই কয়েক মাসের ব্যবধানে ৬৫ বছর বয়সে পা দিলেন। সেই সঙ্গে ঘনিয়ে এল দুজনের অবসর নেবার সময়।

এই উপলক্ষে অ্যাব রোসেনথালের সাংবাদিক জীবন এবং তিনি কী ভাবে নিউইয়র্ক টাইমসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন এই বিষয় নিয়ে পোস্ট তিন কিস্তি ফিচার প্রকাশ করল। তারপর বেন ব্রাডলির কানে এল, অ্যাব তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে বলেছেন, আমার অবসর গ্রহণ নিয়ে পোস্ট তিন কিস্তি লেখা ছাপল বটে, তবে বেন অবসর নিলে নিউইয়র্ক টাইমস এক অনুচ্ছেদের বেশি খবর ছাপবে না।

এই কথা কানে যেতেই বেন চিঠি পাঠালেন— "অ্যাব, অনুচ্ছেদটি এই রকম হবে। ওয়াশিনটন পোস্টের ৩০ বছরের নির্বাহী সম্পাদক বেঞ্জামিন সি ব্রাডলি আজ অবসর নিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন ৭০ বছর। —ও কে (OK) বেন।"

৫.২.৪ সহকারী সম্পাদক

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে Assistant Editor — সহকারী সম্পাদকের ভূমিকা নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "Assistant Editor means a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to the comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism." অর্থাৎ, সহকারী সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সম্পাদকের কাজে নিয়মিতভাবে সাহায্য করা। তাই তিনি সম্পাদকের সহকারী। তাঁর কাজের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে পড়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা, মন্তব্য করা, মতামত প্রকাশ করা এবং সমালোচনামূলক নিবন্ধ লেখা।

বুঝতেই পারছেন, একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে এতরকম কাজ এক হাতে সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। তার জন্য তাঁর চারটি হাত এবং চার হাতে লেখার মত মগজের ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে তা সম্ভব নয়। তাই রাজ্য বা জাতীয় স্তরের খবরের কাগজগুলিতে একাধিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করতে হয়। এই ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। তবে ওই ধরনের কাগজে সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য চার পাঁচজন সহকারী সম্পাদক তো লাগেই।

সহকারী সম্পাদকের বিশেষ বিশেষ দিকে আগ্রহ ও জ্ঞানের বিষয় জেনে নিয়ে সম্পাদক তাঁদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। কেউ কেউ সম্পাদকীয় নিবন্ধ বা টিকা টিপ্পনি লেখার ভার পান। সম্পাদকীয় লেখক সহকারী সম্পাদকদের মধ্যেও কাজের ভাগ থাকে।

কেউ জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেন। কাউকে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে হয়। রাজ্য-রাজনীতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন আর কেউ।

সম্পাদকের কাছে লেখা সাধারণ মানুষের চিঠি, স্তম্ভ লেখকদের রচনা, ফিচার ইত্যাদি সম্পাদনা, পুস্তক সমালোচনার ভারও সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে সম্পাদক বন্টন করে দেন।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের স্তম্ভ লেখকদের মধ্যে অনেকেই একাধিক কাগজে একই লেখা পাঠিয়ে থাকেন। তাঁদের লেখার একমাত্র ভাষা ইংরেজি। সুতরাং হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত কাগজে ইংরেজিতে লেখা স্তম্ভ তরজমা করে নিতে হয়। সেই কাজের দায়িত্বও কোন না কোন সহকারী সম্পাদকের হাতে দেন সম্পাদক।

সম্পাদকীয় পাতার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্যই সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন সম্পাদক। তার অন্যথা হলে মাঝে মাঝে কাজ পণ্ড হতে পারে।

খবরের কাগজের কাজ চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে। সুতরাং সহকারী সম্পাদকরা সুবিধা মত দফতরে এলেন, ইচ্ছা হলে যখন খুশি একটা লেখা ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন এমনটা হতে দেওয়া যায় না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে সহকরী সম্পাদকরা দফতরে এসে যান। সেই সময়টা সাধারণত বেলা ১২টা থেকে ১টা মধ্যে।

সকলে সমবেত হবার পর সেই দিনের বিভিন্ন কাগজের বড় বড় খবরগুলির নানা দিক নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেন। তারপর সম্পাদক তার সহকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁদের মতামত শুনে সেদিন কি কি বিষয়ে কি ভাবে লেখা হবে তা সম্পাদকের নির্দেশে ঠিক হয়ে যায়। তারপর লেখা শুরু।

সন্ধ্যার মধ্যে কপি প্রস্তুত করে ফেলতে হয়। কারণ, সম্পাদকীয় পাতা রাত আটটা নটার মধ্যে ছাপার জন্য তৈরি করে ফেলা দরকার। তৈরি কপি ছাপার জন্য ছেড়ে দেওয়ার আগে সহকারী সম্পাদকরা যে যার লেখার চূড়ান্ত প্রুফে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। এই কাজটাও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এবার আমরা একটি সম্পাদকীয় এবং তার পটভূমি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করব।

২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে গুজরাট মন্ত্রীসভা একটি প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করার জন্য সুপারিশ করল। রাজ্যপাল সেই সুপারিশ বিধি মেনে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে রাষ্ট্রপতি গুজরাট বিধানসভা ভেঙে দিলেন।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলল। বিধানসভা ভেঙে দেবার সুপারিশ করার অধিকার রাজ্য মন্ত্রীসভার আছে। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী মন্ত্রীসভার আইনসঙ্গত কোন সুপারিশ রাজ্যপাল খারিজ করতে পারেন না। তিনি সেই সুপারিশ অনুমোদন করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি বিধানসভা ভেঙে দেবার সুপারিশ রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দিলেন। আইনের পথ ধরে আসা এই সুপারিশ রাষ্ট্রপতি আইন অনুযায়ী অনুমোদন করতে বাধ্য।

সুতরাং তিনিও সেটাই করলেন। ফলে গুজরাট বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই তা ভেঙে গেল। এবার বল চলে গেল দিল্লির নির্বাচন সদনে। নির্বাচন সদনে নির্বাচন কমিশনের দফতর। এই দফতরের প্রধান কর্মকর্তা জেমস মাইকেল লিংডো। তিনি দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner)। নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যেমন আইনের শেষ কথা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও নির্বাচন করার ব্যাপারে শেষ কথা।

ওদিকে গুজরাট সরকারের বিরোধী দলগুলির নেতারা আওয়াজ তুললেন, কয়েক মাস আগে রাজ্যে ভয়ংকর অশান্তি এবং হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। অবস্থা এখনও অস্বাভাবিক। হাজার হাজার মানুষ ভিটা ছাড়া। তাঁদের নির্বাচনে অংশ নেবার মত পরিস্থিতি নেই। অবস্থা আরও না থিতোলে অবাধ এবং ন্যায্য (free and fair) নির্বাচন সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র শুধু সরকারের নয়, বিরোধী পক্ষেরও। সুতরাং নির্বাচন কমিশন গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেখানকার পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখতে কমিশনের কয়েকজন অফিসারকে গুজরাটে পাঠিয়ে দিলেন। কমিশনের এই পদক্ষেপে গুজরাটের শাসক দলের নেতারা তাঁদের অসন্তোষ গোপন করলেন না। কিন্তু কমিশন তার পরোয়া করল না।

অফিসাররা সরেজমিন তদন্ত সেরে রাজধানীতে ফিরে কমিশনকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। তারপর যা ঘটল তাতে গুজরাটের শাসক দলের নেতাদের রক্তচাপ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু লিংডো তাঁর সিদ্ধানেত অটল অবিচল। লিংডো এবং কমিশনের আরও দুজন সদস্য আমেদাবাদ, বরোদা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁদের কাছ থেকে লিখিত স্মারকলিপি গ্রহণ করলেন। তারপর দিল্লি ফিরে কমিশনের বৈঠক করে লিংডো ঘোষণা করলেন, ২ অক্টোবরের মধ্যে গুজরাটে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন করার পরিস্থিতি নেই। সুতরাং কমিশন অক্টোবরের মধ্যে গুজরাটে নির্বাচন করবে না।

লিংডোর এই ঘোষণায় গুজরাটের শাসক দলের নেতারা ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁদের নেতা মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরোদায় ২০ আগস্ট এক জনসভায় বললেন, Some journalists asked me recently has James Michael Lingdoh come from Italy? I said, I don't have his *Janampatri*. I will have ask Rajiv Gandhi. Then the journalists said, "Do they meet in Church?" I replied, "May be they do" (Experts from a translated tape, The Indian Express, 26-8-2002)।

২১ আগস্ট বিভিন্ন খবরের কাগজে লিংডোর বিরুদ্ধে মোদীর ওই সব মন্তব্যের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্য হিন্দুস্তান টাইমস (The Hindustan Times)-এর সহকারী সম্পাদকরা পরদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থার প্রধানকে নিয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। কঠোর ভাষায় এই কাজের সমালোচনা করা উচিত। সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করা উচিত লিংডোকে নিয়ে মোদীর ওই বদরসিকতা অশোভন, অবাঞ্ছিত এবং নীচতার পরিচয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ আগস্ট দ্য হিন্দুস্তান টাইমস-এ নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল—

Shut Up, Mr Modi

Anger and frustration over the Election Commission's move to delay the Gujarat polls seem to have made Narendra Modi resort to the kind of vituperative utterances which are outrageous even by his own fairly low standards. He may have thought that he was cracking a joke when he wondered whether Chief Election Commissioner J.M. Lyngdoh was an Italian, but it was a remark in extremely poor taste. That Mr Modi is unfit to be a chief minister was evident during the riots when he fiddled while Gujarat burnt. But his latest diatribe against a person holding a high constitutional position underlines a meanness of attitude which is shocking in a person heading a government. In a way, Mr Modi may have set a record of being nasty since it is difficult to think of any other chief minister making so egregious a comment. It is a remark which is offensive enough when directed at a politician. But when used against the chief of an autonomous institution, it is unbelievably crude.

The Sangh parivar, of course, has been using abusive epithets against Mr Lyngodh right from the time when he went to Gujarat. Outfits like the VHP have been asking why he doesn't evince the same kind of interest in the refugees from Kashmir, while an RSS spokesman presumed that the CEC was getting his own back against the Hindus for the attacks on Christians in Gujarat earlier. The contretemps in Gujarat have at least extracted an admission from the RSS that the Christians were targeted, for which none other than the saffron camp could have been responsible. Posters and advertisements have also appeared in Gujarat accusing the EC of favourable the minorities.

If anyone presumed that such despicable moves were the handiwork of the more excitable element in the Sangh parivar, Mr Modi has dispelled that impression. Of all the parties, it is the BJP and its fraternal outfits in the Hindutva camp, including the Shiv Sena, which base their campaigns not on politics but on slanderous attacks focusing on religion and community. The reason is obvious. Throughout their history, the RSS and the Jan Sangh-BJP have tried to whip up atavistic sentiments against the minorities to garner the votes of the majority community. Mr Modi is merely being true to that detestable saffron tradition.

দ্য হিন্দুস্তান টাইমসের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতেই বিষয়টি থামল না। জল আরও খানিকটা গড়াল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাজের সাংবিধানিক আলোচনা করার বদলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে মোদী যে কাজটা মোটেই ভাল করেননি সে কথা প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। মোদীকে ভর্ৎসনা করে তিনি ২৪ আগস্ট একটি বিবৃতি প্রচার করলেন। সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট (The Telegraph, 25-8-2002))—

Atal ticks off Modi for Lyngdoh slander

RADHIKA RAMASESHAN

New Delhi, Aug. 24: Prime Minister Atal Behari Vajpayee tonight issued a hard-hitting statement against Gujarat chief minister Narendra Modi for his intemperate and personal remarks against chief election commissioner J.M. Lyngdoh.

Expressing distress at the "undignified controversy", Vajpayee said: "I may have differences over the decision or the attendant observations of the Election Commission with regard to the Assembly polls in Gujarat . There are constitution means to deal with such matters but no one should use improper language or make indecorous insinuations in expressing their views."

The note of censure struck by Vajpayee was aimed directly at Modi, who was quoted as saying at a public rally near Vadodara on Tuesday: "Some journalists asked me recently, 'Has James Michael Lyngdoh come from Italy?' I said I don't have his *janam patri*, I will have to ask Rajiv Gandhi. Then the journalists said, 'Do they (Lyngdoh and Sonia) meet in church?' I replied, 'May be they do'."

But given that Modi has an influential section of backers in the BJP, Vajpayee pulled off a balancing act by making a veiled criticism of Lyngdoh as well.

"Both are high constitutional authorities and must be given the respect that is their due," he said. "It must be recognised by one and all that maturity of our democracy lies in all its institutions working within their constitutional limits, respecting each other's domain and maintaining proper balance."

Vajpayee then appealed to "all those concerned" to put an immediate end to the "unseemly" row. The DMK, too, slammed Modi's remarks as "uncivil".

Vajpayee's grim view follows human resources development minister M.M. Joshi's unexpected criticism of Modi yesterday before RSS brass in Nagpur. "No one, not even a chief minister, should make such remarks against a constitutional authority," he had said.

Since the elevation of L.K. Advani as deputy Prime Minister, Joshi is considered one of the few Vajpayee-backers left in the Cabinet. Observers feel Joshi's remarks were a reflection of the Prime Minister's disquiet.

But Advani, now in the UK, continued to back Modi. In an interview to BBC London, he asserted that the poll panel could not hold up elections in Gujarat and dismissed the "propaganda" against Modi as "bereft of factual content". He also has the backing of BJP chief M. Venkaiah Naidu, indicated by the party's refusal to rap Modi.

Though the BJP rallied behind Modi at the Goa national executive in April, sections in the party had been uneasy about his handling of the riots and the flak it provoked worldwide.

It emerged later that Modi's quit offer was stage-managed, but BJP sources said there was relief among a majority when he announced he would step down. Within minutes, four Advani loyalists — all Cabinet ministers — protested, forcing the gathering to fall in line. Vajpayee, reportedly keen to get rid of Modi, had no option but go along with the "general mood".

লিংডোর বিরুদ্ধে মোদীর ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোদীর ওই বক্তব্যের নিন্দাতেও ব্যাপারটি থামল না। কারণ, দ্য টেলিগ্রাফের ওই রিপোর্টে পরিষ্কার দেখা গেল, সঙ্ঘ পরিবারের মধ্যে মোদীর সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং ২৬ আগস্ট দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে অস্বস্তিকর একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল—

"The PM has spoken— The big question : Will the Gujarat Chief Minister care to listen to him?"

লিংডো-মোদী-বাজপেয়ী কাণ্ড নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখকদের চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে এখানেই ইতি টেনে আমরা এবার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে নজর দেব।

১৯৬৩ সালে সংসদে একটি আইন রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল। সংস্থার কাজ ছিল বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প পরিচালনা। ট্রাস্টের ইউ এস-৬৪ নামে প্রকল্পটি সবচেয়ে বেশি লাভজনক, জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য প্রকল্পে পরিণত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি ইউ এস-৬৪ প্রকল্পে লগ্নি কর বার্ষিক ২০ শতাংশ হারেও লভ্যাংশ অর্জন করেছিল।

কিন্তু দুর্নীতির কারণে ইউ এস-৬৪ সহ ইউনিট ট্রাস্ট একটি রুগ্ন সংস্থায় পরিণত হয়। এর ফলে লগ্নিকারীরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই অবস্থায় ৩১-৮-২০০২ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি ইউ এস-৬৪ প্রসঙ্গে অর্থলগ্নিকারীদের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা করতে ট্রাস্টের সব প্রকল্পগুলি পরিচালনা ব্যবস্থায় মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে ইউনিট ট্রাস্টকে ১৪৫৬১ কোটি টাকা দেবার জন্য সুপারিশ করল কমিটি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী কমিটির এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদকদের কামরায় ঝড় তুলল। এই সিদ্ধান্ত কতটা বলিষ্ঠ, কতটা জনস্বার্থবাহী তা নিয়ে সহকারী সম্পাদকরা চুলচেলা আলোচনা করলেন। তারপর তাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখলেন। দ্য টেলিগ্রাফ ২ সেপ্টেম্বর ইঙ্গিত করল, রুগ্ন ইউ টি আইকে নতুন রক্ত দেবার নাম করে ১৪৫৬১ কোটি টাকা ঢেলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে কেন্দ্রের শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থ। এই সিদ্ধান্ত ভোট ধরার ফাঁদ, "Clearly, the government now has state elections in 2003 in mind and May 2003 is not that far away from Central elections either. This is part of Mr. Jaswant Singh's overall strategy of winning back the middle-class. The poor don't matter."

নয়াদিল্লির দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর (The Indian Express) সহকারী সম্পাদকরা একই দিনে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করলেন। তাঁরা বললেন, ইউ টি আই-এর এই দুর্দশার জন্য আসলে সরকারই দায়ী। তাহলে তারা ইউ টি আইকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে এত সময় নিল কেন?

এক্সপ্রেসের সম্পাদকীয় নিবন্ধটির পূর্ণ বয়ান—

Some sense at least But watch out for the downside of the UTI move

Why did it take so long, is the question that comes to mind immediately when discussing the Rs 14,500 crore UTI bail-out-cum-reforms package announced by the government. After all, the government knew it was really responsible for all the commitments made by UTI to its investors, so there was little point wasting several months in announcing it would guarantee all UTI's promises. All that the delays resulted in, really, was to depress the stock markets further. Since market participants knew UTI was short by over Rs 14,500 crore, in the US-64 as well as various MIP schemes, and since everyone expected UTI to make distress sales of its equity holdings, the sensex was kept low. And keeping the sensex low further increased the hole in UTI's coffers. None of this is rocket science or complicated financial modelling — UTI's chief has been shouting this from the rooftops for several months now.

That apart, the move to split UTI, and to privatise one pat of it, is a good move — based on the current asset-split, over 40 per cent of UTI's various investment schemes fall under what's called UTI-II, the part which will be sold. UTI-II essentially comprises those investment schemes run by UTI in which there are no guarantees on returns. The balance, or UTI-I, will comprise of US-64 and various assured-return schemes for which the bailout has been announced, and this will be retained by the government. Purists will criticise the move as half-hearted, and argue that the government should have sold UTI entirely, as the Malegam committee had proposed. But that was an unimplementable suggestion, as there would be few takers for a scheme with such huge liabilities. Not bailing out UTI was never an option — the government refusing to honour its financial commitment, and that too on such a large scheme, would have hit confidence in the entire financial system, and this would have been too big a risk to take. Why do you think the US government spent over $200 bn bailing out various Savings & Loan institutions in the late nineties?

There is, also, a related issue that is beginning to look quite serious now — the issue of government debt. Today, the total debt adds up to around 58 per cent of GDP, and the UTI bailout package itself will contribute another 0.5 per cent of GDP to this. Add to this the expected costs of the bailout packages for IDBI and IFCI — to be announced later this week — and the total could add up to another one per cent of GDP. With interest payments on this mounting debt now accounting for half the government's total revenue expenses every year, India could well be moving towards a debt-trap. That, after UTI, is the next crisis to watch out for.

কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান (The Statesman) পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক এই বিষয়ে কলম ধরতে দু'দিন বেশি সময় নিলেন বটে কিন্তু তারপর তা দিয়ে যা বেরল তা সবচেয়ে বেশি মারমুখী। ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয় শিরোনামেই তা স্পষ্ট, "ইউ টি আই গুচ্ছ — গরিববিরোধী, বাজারবিরোধী, জুয়াচোর রক্ষাকারী" ("UTI package — Anti-poor, Anti-market, Pro-crook")

এতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইউ টি আই বাঁচাবার খরচটা আসবে কার থেকে? করদাতাদের পকেট থেকে তো? কিন্তু তারা সবাই তো ইউ টি আইতে টাকা লগ্নি করেনি? তাহলে তাদের টাকায় দানসাগর কেন?

দ্য স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় নিবন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সোজাসুজি জানতে চাওয়া হল, "ইউ টি আই-এর তহবিলের যে সব মাতব্বর ছায়াচ্ছন্ন নানা সংস্থার শেয়ারে লগ্নির জন্য দায়ী তাদের কি ব্যবস্থা হবে?"

এই সব সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির পূর্ণ পাঠ অথবা রূপরেখা পড়ে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারলেন একই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ওপর মন্তব্য করতে পারে। তাছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে অত্যন্ত কঠোর এবং আক্রমণাত্মকভাবে সরকারের সমালোচনা করতে পারা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে খবরের কাগজের এই স্বাধীনতা শুধু স্বীকৃত নয়, তা সুরক্ষিতও।

৫.২.৫ বার্তা সম্পাদক

খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নের জবাবে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি (১.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন) বলেছে, "News Editor means a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper" — অর্থাৎ, বার্তা বিভাগের কাজকর্মে সমন্বয় করা এবং তদারক করা বার্তা সম্পাদকের কাজ। কাগজের প্রতিটি সংস্করণে প্রকাশিত খবরের দায়দায়িত্ব তাঁর।

খবরের কাগজের প্রধান উপাদান খবর। তার মধ্যে থাকে স্থানীয় সংবাদ, রাজ্যের সংবাদ, জাতীয় সংবাদ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ।

মালদা, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙ্গন স্থানীয় সংবাদ।

কম বৃষ্টিপাতের দরুন খরা বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার স্থানীয় সংবাদ।

পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচন স্থানীয় সংবাদ।

বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সর্বাত্মক আন্দোলন, বনধ, রাজনৈতিক কাজকর্ম রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

রাজ্যের বাজেট, উন্নয়নের পরিকল্পনা, তা রূপায়ণে সাফল্য বা ব্যর্থতা; মহাকরণে, নব সচিবালয়ে, বিধাননগরে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরের কাজকর্ম, বৈঠক সিদ্ধান্ত এ সবই রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

তেমনি দেশের রাজধানীতে সরকারি কার্যকলাপ, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের আগমন ও কার্যকলাপ, সংসদের অধিবেশন ইত্যাদি জাতীয় স্তরের সংবাদ।

ওয়াশিংটন, বেজিং, ইসলামাবাদ, কাবুল, ঢাকা, কাঠমান্ডু, মস্কো, লন্ডন প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া বড় বড় ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদ। সেই সব ঘটনা ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত হলে তা ভারতের কাগজগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তা না হলেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা পাঠকরা জানতে আগ্রহী। সুতরাং সেই ধরনের খবরও ছোট করেই হোক বা বড় করেই হোক কাগজে স্থান দিতে হয়।

এতরকম সূত্র থেকে নিত্য অনেক রকম খবর বার্তা বিভাগে এসে জমা হয়। সেই সব খবর যথাযথ ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থাপনার জন্য ডেস্ক এবং রিপোর্টিং উভয় উপবিভাগের মধ্যে সমন্বয় করেন বার্তা সম্পাদক। তাঁর সিদ্ধান্ত যথাসময়ে ঠিকভাবে পালিত হল কি না সে দিকেও তাঁকেই নজর রাখতে হয়।

বিশেষ করে আপৎকালীন ঘটনা বা অবস্থার খবর প্রকাশনায় কাগজের সাফল্য বা ব্যর্থতা বার্তা সম্পাদকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। সেই রকম কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেলে বার্তা সম্পাদক কি ভাবে কাজ করেন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা' (ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা - ৭০০ ০০৩) বই থেকে তা নেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের পটভূমি ছিল এই রকম—

স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের মতবিরোধ তুঙ্গে। কংগ্রেস ছেড়ে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নতুন দল গড়লেন। তার নাম দিলেন স্বরাজ পার্টি।

এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটল কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি কাগজে। তার একটি ছিল গান্ধী ও কংগ্রেসের সমর্থক 'সার্ভেন্ট'। অপরটি ছিল স্বরাজ পার্টির সমর্থক 'ফরোয়ার্ড'। সার্ভেন্টের সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বিধুভূষণ ছিলেন সার্ভেন্টের বার্তা সম্পাদক।

তিনি সকালেই অফিসে গিয়ে বার্তা বিভাগে কাজে বসে পড়তেন। বেলা বারটা পর্যন্ত কাজ করে তিনি মধ্যাহ্নভোজের জন্যে বাড়ি যেতেন। বেলা একটার মধ্যে আবার অফিস, আবার একটানা কাজ। এমনই একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত। দার্জিলিং থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাত্র দু লাইনের টেলিগ্রামে খবর এল, চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনাবসান হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন দাস তো শুধু চিত্তরঞ্জন দাস নন, তিনি যে দেশবন্ধু। সুতরাং মাত্র দু লাইনের খবর দিয়ে পাঠকদের সংবাদের ক্ষুধা মিটবে না। এই অবস্থায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই খবর পরিবেশন করতেই হবে। "সারা দেশের কান্নাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে"। তার ব্যবস্থা করতে বিদ্যুৎগতিতে সমন্বয়ের কাজে লেগে গেলেন বিধুভূষণ। তিনি প্রথমেই চিফ রিপোর্টারকে প্রত্যেকের কর্তব্য (assignment) বুঝিয়ে দিলেন। কাজের মধ্যে ছিল দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত খবর যোগাড় করা। তা পাওয়া যাবে দেশবন্ধুর শ্যালক এস এন হালদার এবং তাঁর দুই জামাতার কাছ থেকে। এই বিষয়ে তাঁদের কাছে যে সব চিঠি ও তার ছিল সে সবের কপি সংগ্রহ করতে হবে। শরৎচন্দ্র বসু এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর কাছ থেকেও এই বিষয়ে তথ্য যোগাড় করতে হবে।

এই সব খবরের সঙ্গে দিতে হবে দেশবন্ধুর জীবনী। তার তথ্য চট করে কোথায় পাওয়া যাবে? বিধুভূষণ এক লহমায় নির্দেশ দিলেন, জি ন্যাটশন কর্তৃক প্রকাশিত দেশবন্ধুর জীবনী গ্রন্থটি কিনে আনতে হবে। তা থেকেই লেখা হবে দেশবন্ধুর পরিচয়। তাছাড়া, জননেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে রিপোর্টাররা শ্রদ্ধাঞ্জলী যোগাড় করলেন। এই সব খবর কিভাবে কোথায় ছাপা হবে তা চিফ সাব-এডিটরকে বুঝিয়ে দিলেন বিধুভূষণ।

"খুব দ্রুত কাজ চললো। আমরা কি করছি বাইরের লোক তা জানতেই পারলো না। রাত দুটো পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশবন্ধুর" যথাযোগ্য স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা করলেন সার্ভেন্টের বার্তা সম্পাদক বিধুভূষণ।

"পরের দিন আশাতীত ঘটনা। ত্রিশ হাজার কপি সার্ভেন্ট বিক্রি হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার পরও ভিড়, তারপরও চাহিদা। সার্ভেন্ট চাই।

"দিতে পারি না। মফঃস্বল থেকে চিঠির তাড়া আসে দয়া করে সে দিনের একখণ্ড কাগজ পাঠান।"

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের খবর পরিবেশনে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা হয়েছে। এই বিবরণ বিশ্লেষণ করলে আপনারা দেখবেন, বিধুভূষণ জানতেন দেশবন্ধুর নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত জীবনী চট করে কোথা থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, আপৎকালে বিভিন্ন বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাঁর জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক খবরটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তাঁর স্বচ্ছ ধারণা থাকে দরকার। সেই সঙ্গে দরকার সেই সব উপাদান কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। বার্তা সম্পাদকের আরও দরকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ একলহমায় বোঝার মত ঘ্রাণশক্তি, পাঠকের নাড়ীজ্ঞান। পাঠক কাগজ থেকে কি চায় তা বুঝতে না পারলে খবরের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ভুল হয়ে যাবে। এই সবের সঙ্গে চাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করার মত মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা। এ সবের সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা থাকলে তিনি তো বার্তা বিভাগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন। খবরই হয়ে উঠবে তাঁর ধ্যানজ্ঞান বিলাস বিশ্রাম স্বপ্ন। তবেই একজন সাংবাদিক সফল বার্তা সম্পাদকের মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জন করতে পারবেন।

খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা ও কাজকর্ম সম্পর্কে এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল তা সাবেকি ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও মুদ্রণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে খবর কাজ সম্পাদনার রীতি নীতি এবং কাঠামোও বদলে যাচ্ছে। সেই সূত্রে দেশে ও বিদেশে অনেক বড় বড় কাগজে বার্তা সম্পাদকের পদ লোপ পাচ্ছে অথবা তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। বার্তা সম্পাদকের কাজ চলে যাচ্ছে নতুন নতুন পদাধিকারীর হাতে।

এই ব্যাপারে Benjamin Crowninshield Bradlee — বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাডলিকে পথপ্রদর্শক বলা ধরা হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে ১৯৬৫ সালে তিনি নির্বাহী সম্পাদক হয়ে যোগ দেন। পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হবার আগে তিনি নিউজউইকের ওয়াশিংটন ব্যুরোর প্রধান ছিলেন। পোস্টকে মন্দা দশা থেকে উদ্ধার করে চাঙ্গা করার জন্য তিনি নিউজ ডেস্ককে তিনটি আলাদা উপবিভাগে ভাগ করে দিলেন— বৈদেশিক, জাতীয় এবং স্থানীয় ডেস্ক। তিনজন ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরকে ওই তিনটি ডেস্ক পরিচালনার ভার দেন তিনি।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই নতুন ব্যবস্থা চালু করে বার্তা বিভাগে বার্তা সম্পাদকের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে দেওয়া হল। এর পেছনে হয়ত বেনের যুক্তি ছিল, একজন প্রধান পদাধিকারীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সংবাদ ক্ষেত্রকে পরিচালনা করা খুবই শক্ত কাজ। তার বদলে এক একজন মূল পরিচালকের মধ্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় খবরের ক্ষেত্রকে ভাগ করে দিলে নানা রকম সুবিধা হবে। নির্বাহী সম্পাদকের কাছে ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরদের দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে।

৫.২.৬ মুখ্য অবর সম্পাদক

পদের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সাব-এডিটরদের মধ্যে যিনি মধ্যমণি তিনিই মুখ্য অবর সম্পাদক। আমরা এরপর থেকে তাকে চিফ সাব বলে উল্লেখ করব। খবরের কাগজে চিফ সাব-এডিটরকে সংক্ষেপে চিফ সাব বলেই উল্লেখ করা হয়।

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী "Chief Sub-Editor means a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it" — অর্থাৎ যিনি বার্তা বিভাগে নির্ধারিত পালার (Shift) কাজ পরিচালনা করেন তিনিই চিফ সাব। ভারপ্রাপ্ত পালায় নিউজ ডেস্ক তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। পালায় কর্মরত সাব-এডিটররা কাজের নির্দেশ পান চিফ সাবের কাছ থেকে। তাঁরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলেন কি না তা নজরে রাখাও চিফ সাবের কাজ। কোন খবর কোন পাতার কোন স্থানে কতটা জায়গা নিয়ে ছাপা হবে তাও তিনিই ঠিক করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, কাগজের নির্দিষ্ট পালায় নিউজ ডেস্কের চালকের আসনে থাকেন চিফ সাব।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আপনি তিনটি নতুন কথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন— শিফট, নিউজ ডেস্ক এবং সাব-এডিটর। সাব-এডিটরদের বিষয় আমরা পরে জানব। সেই সঙ্গে জানব নিউজ ডেস্ক কাকে বলে। আপাতত আমরা শিফট বা পালা কথাটির বিষয় জেনে রাখি।

খবরের কাগজের বিভিন্ন সংস্করণ দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় প্রকাশিত কাগজ আমরা দেখে থাকি। এগুলির মধ্যে প্রভাতী কাগজগুলিতে দিনের ২৪ ঘণ্টা সময়কে পালায় বা শিফটে ভাগ করে কাজ চালাতে হয়।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত — সাধারণত এই চারটি পালায় প্রভাতী খবরের কাগজে কাজ হয়। হঠাৎ কোন খুব বড় ঘটনা ঘটে না গেলে সকালের পালা প্রায় গুরুত্বহীন শিফট। একজন সাব-এডিটরই সেই পালায় নিউজ ডেস্কে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। হাল আমলে তাঁর কাজ মাঝে মাঝে সংবাদ সংস্থার কম্পিউটার মনিটরে দৃষ্টিপাত করা। সাবেক আমল হলে কম্পিউটার মনিটরের বদলে টেলিপ্রিন্টার থেকে ওপরে দেওয়া খবর বোঝাই কাগজের দিকে নজর রাখতে হত তাঁকে।

এই রকম হালকা কাজের শিফটে চিফ সাবের দরকার হয় না। চিফ সাব ডেস্কের ভার নেন দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের পালায়। খবরের চাপ সব চেয়ে বেশি বাড়ে সন্ধ্যার পালায়। রাতের পালায় সাধারণত বড় বড় খবরের চাপ থিতোতে থাকে। তখন মাথা চাড়া দেয় কাগজের প্রথম পাতা সাজাবার চাপ। চিফ সাবের পরিচালনায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ এগোতে থাকে বার্তা বিভাগের নিউজ ডেস্কে।

আপনারা জেনেছেন সাব-এডিটররা তাঁদের কাজের নির্দেশ পান চিফ সাবের কাছ থেকে। কোন সাব-এডিটরকে রিপোর্টারদের কপি দেখার ভার দেন চিফ সাব। বাংলা কাগজ হলে সংবাদ সংস্থার (News Agency) সরবরাহ করা খবর আর কাউকে তরজমা করতে বলেন চিফ সাব। সেই সঙ্গে তিনি বলে দিতে থাকেন "টপ (Top)", "২ কলম", "বড় জোর কুড়ি লাইন", "অ্যাঙ্কর (Anchor)" ইত্যাদি শব্দ। সাব-এডিটররা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেন, খবরের আয়তন ও অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন চিফ সাব।

জটিল ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য চিফ সাব নিজের হাতে নেন। তা সামলাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাব-এডিটরদের হাত থেকে সম্পাদনা হয়ে আসা খবরগুলিতে চোখ বোলাতে থাকেন। প্রয়োজনে সেগুলি ফের ঘসামাজা করে দেন। কোন কপি তাঁর মনে না ধরলে তা ফের লিখতে বলেন বা সময় থাকলে নিজেই নতুন করে লিখে ফেলেন। এই সব কারণে পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ সাবকে বার্তা সম্পাদকের সমতুল্য পদাধিকারী বলে মনে করা হয়। যারা অতটা মনে না করেন তাঁরাও স্বীকার করেন বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত পালার চিফ সাব। কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হলে চিফ সাব অবশ্যই বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে মুখোমুখি অথবা টেলিফোনে পরামর্শ করে নেন।

খবরের কাগজে দুপুরের পালা এবং রাতের পালার মাঝখানে থাকে সন্ধ্যার পালা। এই পালা দুপুর ও রাতের পালার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে থাকে বলে সন্ধ্যার পালাকে Mid Shift বা মাঝের পালা অথবা Link Shift বা সংযোগকারী পালা বলেও অভিহিত করা হয়।

মাঝের পালার চিফ সাব দুপুরের পালার চিফ সাবের কাছ থেকে খবরের স্রোত সম্পর্কে যা যা জানার তা জেনে নেন। ছুটির আগে তিনি রাতের চিফ সাবকে একই বিষয়ে অবহিত করে অফিস থেকে বিদায় নেন। এই ব্যবস্থার ফলে তিনটি পালার চিফ সাবই চট করে কাজে হাত দিতে পারেন।

সাধারণত প্রতিদিন রাত আটটা নটার মধ্যে চিফ সাব জানতে পারেন কলকাতায়, দিল্লিতে, ওয়াশিংটনে, কাবুলে বা শিলিগুড়িতে কি কি বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি খবরের কপি সাব-এডিটরদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। তাঁরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। তারই মধ্যে তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন পরদিনের কাগজের প্রধান খবর কোনটি হওয়া উচিত। সেই খবরটির ব্যবস্থা তিনি নিজেই সাধারণত করে থাকেন।

চিফ সাবের মাধ্যমে বার্তা সম্পাদকও মাঝে মাঝে খবরের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানছেন। বার্তা সম্পাদক চিফ সাবকে পরামর্শ দিচ্ছেন। চিফ সাব কোন সমস্যায় পড়লে বার্তা সম্পাদকের নির্দেশ চাইছেন।

এই সব কর্মপ্রবাহের মধ্যে সংবাদ চিত্রগুলি এসে যাচ্ছে। চিফ সাব ছবি যাচাই করে তা খবরের সঙ্গে ছাপার জন্য বাছাই করছেন। লম্বা চওড়ায় কোন ছবির কি মাপ হবে তা বলে দিচ্ছেন। তারই মধ্যে সাব এডিটরদের তৈরি কপি চিফ সাবের হাতে আসছে। তিনি সে সব পড়ে কিছু করণীয় থাকলে করছেন। সে পর্ব মিটিয়ে কপি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে পরের দিনের কাগজ তৈরিতে মাঝের পালাকে ব্যবহার করেন চিফ সাব।

মাঝের পালা সাঙ্গ হলে জেগে ওঠে রাতের পালা। রাতের পালা পরের দিনের কাগজ তৈরির শেষ পর্ব। এই পর্ব শেষ হয় বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে মাঝের পালা এবং রাতের পালার চিফ সাবের বৈঠকে। এই বৈঠকের প্রধান কাজ পরের দিনের কাগজের প্রথম পাতাটি তৈরির সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়ে রাতের পালার চিফ সাফ নিউজ ডেস্কে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসেন। তাঁর সেই আসন নিউজ ডেস্কে সাব এডিটরদের মাঝখানে, নয়ত নিউজ রুমের কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আলাদা ডেস্কে অবস্থিত হতে পারে। তাঁর আসনের অবস্থান যে খানেই হোক না কেন তাঁকে সাব এডিটরদের কাছাকাছি থাকতে হয়।

অভিজ্ঞ সাব-এডিটরদের সহযোগিতায় প্রথম পাতার অঙ্গসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ হয়। ক্রমে এগিয়ে আসে কাগজ ছাপা আরম্ভ হবার সময়। ছাপার আদেশ (Print Order) দেবার আগে চিফ সাবের শেষ কাজ পুরো প্রথম পাতার চূড়ান্ত প্রুফে (Blanket Proof) সতর্কভাবে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। এই কাজের উদ্দেশ্য হল, কোথাও কোন ভুল থেকে গেছে কিনা তা শেষবারের মত দেখে নেওয়া। এই কাজে অবহেলা হলে নানা রকম ভুল থেকে যেতে পারে। শিরোনামে ভুল থাকতে পারে, চিত্র পরিচিতিতে ভুল থাকতে পারে, একই খবর দু'জায়গায় বসে যেতে পারে। কিন্তু এক খবরের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য খবরের ছবি লেগে যেতে পারে।

বিশ্বাস করুন, এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা কালেভদ্রে হলেও ঘটে থাকে। এমন বিভ্রাটও ঘটেছে যে চিত্র পরিচিতিতে সাংসদকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন খবরে তাঁকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে চিত্রগ্রাহক ঐ চিত্র পরিচিতিতে সাংসদকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করেছেন ভুলের জন্য তিনি দায়ী। যে সাব-এডিটর সেই ভুলটি সংশোধন করতে ব্যর্থ হলেন তাঁর দায়িত্বও এই ব্যাপারে কম নয়। চিফ সাবের চোখে এই ভুল ধরা পড়ল না বলে তিনিও এই ব্যাপারে সমান দোষী হবেন।

এই ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আপনাদের বোঝার সুবিধা হবে। ২৫-৮-২০০২ তারিখে এক কাগজে একটি ছবির ক্যাপশন—

শনিবার সুতানুটি উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। মঞ্চে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক বিপ্লব দাশগুপ্ত ইত্যাদি।

ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিপ্লব দাশগুপ্ত নামে কোন বিধায়ক ছিলেন না। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত একজন রাজ্যসভা সদস্যের নাম বিপ্লব দাশগুপ্ত। ডেস্কের এক মুহূর্তের অবহেলায় বিপ্লব দাশগুপ্ত সাংসদ থেকে বিধায়ক হয়ে গেলেন। আরও লজ্জার কথা, খবরে কিন্তু বিপ্লব দাশগুপ্তকে সাংসদ বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার আপনারা দেখবেন শিরোনামে উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ের ঘটনা। ১-৯-২০০২ তারিখে 'ট' কাগজের প্রথম পাতায় দুটি খবর পাশাপাশি উল্টো-পালটা শিরোনামে প্রকাশের দৃষ্টান্ত—

সোনিয়ার পাশে সাধন

ইউ এস-৬৪ সমেত অন্যান্য আমানতে বিরাট ক্ষতির মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু দিন চলার পর এবার ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়াকে বাঁচাতে এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিং শনিবার ইউ টি আই-কে মোট ১৪ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার ইউ টি আই-কে দুভাগে ভেঙে দিচ্ছে। প্রথমভাগে ইউ এস-৬৪-র জন্য ধার্য হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পলিসির জন্য মোট ৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ইউ এস-৬৪ নিয়ে বিরাট আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে শুরু হয়েছিল অচলাবস্থা। আমানতকারীরা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন টাকা ফেরত পাওয়ার আশা। অতি স্বল্প মূল্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল কেনা সার্টিফিকেট বিক্রির হিড়িক। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ অনেকটা নিশ্চিন্ত করবে গ্রাহকদের। অন্যদিকে সরকার শর্তসাপেক্ষে জানিয়েছে, একমাত্র অবশ্যফেরতযোগ্য অর্থের ক্ষেত্রেই তারা সাহায্য দেবে। সরকার ইউ এস-৬৪-র ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের সময় ২০০৩ পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে। এদিকে এই ১৪ হাজার কোটি টাকা সরকার টাকায় নয়, বরং বাজারে বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে ইউ টি আইকে দেবে।

ইউনিট ট্রাস্ট চাঙ্গা

বিদেশিনী-বিতর্কে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল কংগ্রসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সাধন পান্ডে। শনিবার তিনি বলেন, আমাদের দল এখন যেকোনও অন্য দলের থেকে সম-দূরত্বের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু জয়ললিতা যে-ভাবে বিদেশিনী ইস্যুতে সোনিয়া গান্ধীর প্রধামন্ত্রিত্বের বিরোধিতা করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। মানুষ যাকে চাইবেন, লোকসভায় যাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। জয়ললিতাও তো একবার সমর্থন করে চিঠি দিয়েছিলেন। সাধনবাবু বলেন, কোনদিন দেখব পাকিস্তানে জন্মের কারণে উনি লালকৃষ্ণ আদবানির উপপ্রধানমন্ত্রিত্বের বিরোধিতা করছেন। সাধনবাবুর এহেন বিবৃতিতে চাঞ্চল্য তুঙ্গে। কারণ, গান্ধী-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল। তৃণমূলের মধ্যেও তিনি 'প্রো-কংগ্রেস' ঘরানা বলে পরিচিত। এদিকে এদিকে 'খবরের কাগজ'-এ প্রকাশিত সুদীপ ব্যানার্জির বক্তব্য নিয়ে দলে ব্যাপক জলঘোলা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে বসে তাপস রায়, বৈশ্বানর চ্যাটার্জি, সজল ঘোষের সামনে মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করেছিলেন সুদীপবাবু। সেসব কথা ফাঁস হয়ে যেতেই চূড়ান্ত অস্বস্তি।

'গ' কাগজে ১০-৯-২০০২ তারিখে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "Mamata tea cup woes brim over"। চার কলম লম্বা শিরোনামের এই খবরের মধ্যে Special Correspondent লিখলেন—

Sources said Mamata has also decided to appoint Nitish Sengupta, MP from Tamluk, the in-charge of the Delhi unit of the party.

এই খবর পড়ার আগে জানা ছিল না যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দিল্লি শাখা আছে। সত্যসত্যই তা আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেয়ে একটি বড় ভুলের দিকে আমরা বরং নজর দিই। খবরে নীতীশ সেনগুপ্তকে সাংসদ বলা হয়েছে। তাতে কোন ভুল হয়নি। ভুলটা হয়েছে তাঁকে তমলুকের সাংসদ বানিয়ে দেওয়া। আসলে তমলুকের সাংসদ সিপিআইএম দলের লক্ষ্মণ শেঠ। আর নীতীশবাবু কাঁথির সাংসদ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিত করে যে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে তা ভাঙার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক আন্দোলনের ডাক দেয়। ৯-৯-২০০২ তারিখে 'খ' কাগজে একটি রিপোর্ট লেখা হল—

দলের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, তাঁদের সঙ্গে আর কেউ না থাকলেও তাঁরা একাই এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এ ক্ষেত্রে ভুলটা হয়েছে অশোক ঘোষের পদাধিকার বর্ণনায়। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নন, শুধুই সম্পাদক। ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্রে প্রাদেশিক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদকের পদ নেই। সাধারণ সম্পাদকের পদ আছে সর্বভারতীয় কমিটিতে।

খবরের কাগজ প্রকাশনায় কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার আগে একটি বড় চতুষ্কোণ বা ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিবিশিষ্ট টেবিলে যাবতীয় খবর এসে জড়ো হত। ওই টেবিলকে বলা হত নিউজ ডেস্ক, সংক্ষেপে ডেস্ক। খবর ছোট করা, বড় করা, নতুন করে লেখা, শিরোনাম লেখা সবই হত ডেস্কে। ডেস্কের মাঝখানে বসতেন পালার চিফ সাব। সেখানে বসেই চিফ সাব খবরের গুরুত্ব, অগ্রাধিকার ও স্থান নির্বাচন করতেন। ডেস্কেই ছিল চিফ সাবের রাজত্ব।

৫.২.৭ মুখ্য প্রতিবেদক

এই অনুচ্ছেদে আমরা মুখ্য প্রতিবেদক কথাটি আর ব্যবহার করব না। কারণ, সাংবাদিকদের কাছে মুখ্য প্রতিবেদক কথাটি চালু নয়। তার বদলে আমরা এর পর থেকে বরাবর চিফ রিপোর্টার বলে উল্লেখ করব।

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে চিফ রিপোর্টারকে এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "Chief Reporter means a person who is in-charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly report and interprets all news of legislative, political or general importance." — অর্থাৎ, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা তাঁদের চিফ রিপোর্টার। তাঁর এই পদাধিকারকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব—

তিনি কাগজের প্রধান দফতরে কাজ করেন। সেই দফতরে যে সব রিপোর্টার কাজ করেন তাঁরা সবাই চিফ রিপোর্টারের অধীন। তাঁদের কাজের তদারক করেন চিফ রিপোর্টার। তিনিই রিপোর্টারদের কাজ বুঝিয়ে দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেন। কোন রিপোর্টারের কাজে গলদ, খুঁত বা ফাঁক থাকলে তিনি সেই রিপোর্টারকে উপযুক্ত নির্দেশ দেন। তার সঙ্গে চিফ রিপোর্টার নিজেও রোজ কিছু না কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর লেখেন, তার পটভূমি বর্ণনা করেন বা তা বিশ্লেষণ করেন।

ধরুন, তখন বিধানসভার অধিবেশন চলছে। সেই দিন পুলিশ বাজেটের জন্য অর্থবরাদ্দের দাবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতার প্রারম্ভিক ভাষণ এবং পুলিশমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ শোনার জন্য চিফ রিপোর্টার বিধানসভায় যাবেন। তিনি খবরের মুখবন্ধ লিখতে পারেন। কিম্বা কোন পয়েন্ট নিয়ে প্রাসঙ্গিক মালমশলা সংগ্রহ করে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতে পারেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, রাজনৈতিক সংবাদদাতা থেকে আরম্ভ করে স্টাফ রিপোর্টার পর্যন্ত সবাই রিপোর্টার। তাঁরা সবাই কিন্তু চিফ রিপোর্টারের অধীনে কাজ করেন না। শুধু স্টাফ রিপোর্টারদের নিয়েই চিফ রিপোর্টারের বাহিনী গঠিত হয়।

রাজ্যের বা দেশের অন্যান্য রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ শহরে, রাজধানীতে বা জেলায় যে সব রিপোর্টার কাজ করছেন তাঁদেরও চিফ রিপোর্টার পরিচালনা করেন না। তাঁদের পরিচালনা করার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ শুরু হয় আগের দিন রাতে। তিনি একটি ডায়েরি রাখেন। তাকে বলা হয় Assignment Book — দায়িত্বের খাতা। পরের দিনের প্রত্যাশিত খবরগুলির তালিকা তাতে লিখে ফেলেন চিফ রিপোর্টার। যেমন— মহাকরণ, লালবাজার, কর্পোরেশন, শিক্ষা, বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠক, বিধানসভা, ধর্মতলায় পথ অবরোধ, শিল্প মহাসঙ্ঘের সেমিনার, বিরোধী দলনেতার সাংবাদিক বৈঠক ইত্যাদি।

প্রত্যাশিত খবরের এই বিষয়গুলির বাঁ দিকে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টারদের নাম সংক্ষেপে লিখে দেন। ধরুন কোন রিপোর্টারকে বিধানসভায় যেতে হবে। তাঁর নাম অনির্বাণ চৌধুরী। চিফ রিপোর্টার তালিকার যেখানে বিধানসভা লেখা আছে তার বাঁ পাশে সংক্ষেপে লিখে দিতে পারেন অ চৌ।

রিপোর্টাররাও ছুটির পর বাড়ি যাবার আগে চিফ রিপোর্টারের কাছ থেকে পরের দিনের কাজের দায়িত্ব জেনে নেবেন।

অপ্রত্যাশিত খবরের জন্যও রিপোর্টিং বিভাগকে তৈরি রাখেন চিফ রিপোর্টার। বড় বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন কাগজের রিপোর্টিং বিভাগে ২৪ ঘণ্টাই লাল সঙ্কেত জারি আছে। হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে তার খবর পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারকে ঘটনাস্থলে দৌড়তে হয়।

তেমন ঘটনা দিনে রাতে যে কোন সময়ে ঘটে যেতে পারে। মাঝরাতে কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়ে কিছু লোকের মৃত্যু হতে পারে। শেষরাতে বিবাদীবাগের কোন বহুতল অফিস বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে কোন বাড়িতে বিস্ফোরণে অনেক লোক হতাহত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে এই ধরনের খবর যোগাড় করার জন্য দায়িত্ব বন্টনের খাতায় Day এবং Night হলে দুটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এই দুটি কাজও রিপোর্টারদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে বন্টন করেন দেন চিফ রিপোর্টার। এই কাজগুলি সারার পর চিফ রিপোর্টারের ছুটি মেলে।

কাজের দিন নির্ধারিত সময়ে দফতরে পৌঁছে চিফ রিপোর্টার তখন বিভাগে উপস্থিত রিপোর্টারদের কাছ থেকে সে দিনের খবরের অবস্থা বুঝে নেন। ডেস্কে গিয়েও দেশ-বিদেশের কোথায় কি ঘটছে বা ঘটতে পারে তাও জেনে নেন। সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকের ডাকে দিনের মধ্যে একবার বা একাধিকবার বৈঠক করেন চিফ রিপোর্টার। বার্তা বিভাগের কাজে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্যই চিফ রিপোর্টারকে এইসব দায়িত্ব পালন করতে হয়। কারণ, সারা দিন ধরে ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যাশিত পথে বইতে পারে, নাও পারে। বেলা ১২টার বৈঠকে চিফ রিপোর্টার তাঁর কাজের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রত্যাশিত খবরের যে তালিকা দিলেন তার ভিত্তিতে পরের দিনের কাগজ বের করার খসড়া পরিকল্পনা তৈরি হল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা তৈরি হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কোন বড় ব্যাপার ঘটল। তখন আগের তৈরি পরিকল্পনা সংশোধিত হল বিকাল ৪টার বৈঠকে।

শেষ বৈঠক রাত আটটা বা নটায়। তখন দেখা গেল অবস্থার আরও বড় ধরনের পরিবর্তন করতে হল। পরিবর্তিত পরিকল্পনায় চিফ রিপোর্টারের এলাকার আরও কিছু খবর দরকার। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব বন্টন করতে হয় চিফ রিপোর্টারকেই। রিপোর্টারদের কপি পরীক্ষা করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় কাজ। সেই কাজটি প্রথমে করেন চিফ রিপোর্টার।

রিপোর্টাররা কাজ সেরে অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখে তা চিফ রিপোর্টারকে দেন। তিনি তা খুঁটিয়ে পড়েন। এই কাজকে বলে কপি পরীক্ষা (Check) করা। এই সময়ে তিনি দেখেন ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা, তথ্য নির্ভুল কিনা, মুখবন্ধ ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা। বাক্যগঠন ও শব্দ প্রয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা সেদিকেও তাঁকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। লেখায় অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকলে তা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলার কাজও চিফ রিপোর্টারই করেন। এই সব পর্ব মিটিয়ে তিনি পরীক্ষায় পাস করা স্টাফ রিপোর্টারের কপি সম্পাদনার জন্য ডেস্কে পাঠিয়ে দেন।

চিফ রিপোর্টারকে বার্তা সম্পাদকের অধীনে কাজ করতে হয়। রিপোর্টারদের কাজের কোন ব্যর্থতার জন্য চিফ রিপোর্টারকে বার্তা সম্পাদকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর ওই শহর থেকে প্রকাশিত অন্যান্য খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হলে এবং অন্য একটি কাগজে তা প্রকাশিত না হলে তাকে Miss — হাতছাড়া বলা হয়। সেই বিশেষ খবরটি রিপোর্টিং বিভাগ থেকে ডেস্কে না এসে থাকলে তারও জবাবদিহি করতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

৫.২.৮ বিশেষ সংবাদদাতা

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি (১.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন) অনুযায়ী "Special Correspondent means a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or otherwise at the headquarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such." — অর্থাৎ, যে তক্তি নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে খবর লেখেন এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকেন তিনি বিশেষ সংবাদদাতা। তাঁর কাজের বিষয় রাজ্য আইনসভা, সংসদ, রাজনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ঘটনা। তাঁর সরকারি স্বীকৃতিপত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি দেশের রাজধানীতে, এক বা একাধিক রাজ্যের রাজধানীতে, বিদেশে বা মূল কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পারেন বা বিশেষ কোন ঘটনার খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হতে পারেন।

এই সংজ্ঞা থেকে আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন, রাজনৈতিক সংবাদদাতা, বৈদেশিক সংবাদদাতা, সমর সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতাও বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁদের সকলেরই সরকারি পরিচয়পত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। দিল্লিতে সংসদের লোকসভা, রাজ্যসভা ও সংসদের সেন্ট্রাল হল বলে পরিচিত লবিতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করার ছাড়পত্র সরকরি পরিচয়পত্র। দিল্লিতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পি আই বি) নানা দিক বিচার বিবেচনা করে সাংবাদিকদের এই পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে। সংসদের সচিবালয় থেকেও পরিচয়পত্র নিতে হয়। পি আই বি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন একটি বিভাগ। এই বিভাগের মাথা Principle Information Officer — মুখ্য তথ্য আধিকারিক।

দিল্লিতে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক এবং রেল ভবন, শ্রমশক্তি ভবন, উদ্যোক্তা ভবন ইত্যাদি ভবনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রবেশাধিকার পেতে গেলেও পি আই বি'র দেওয়া পরিচয়পত্রটি সঙ্গে থাকা দরকার। অবশ্য উঁচু মহলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সূত্রগুলির সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকলে ওই পরিচয়পত্র ছাড়াও কাজ করা যায়। তবে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত তৎপরতার কারণে সব পদের সংবাদদাতাদের সরকারি পরিচয়পত্র থাকা ও তা সঙ্গে বহন করা বাঞ্ছনীয়।

এই সুযোগে আমরা একজন সংসদীয়, সংবাদদাতার কাজের ধরন তাঁর নিজের মুখেই শুনব। তাঁর নাম অজিত ভট্টাচার্য। ৬-৮-২০০২ তারিখে The Asian Age — দ্য এশিয়ান এজ পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—

পঞ্চাশের দশকে তিনি দ্য স্টেটসম্যানের হয়ে সংসদের কাজকর্ম রিপোর্ট করতেন। প্রতিদিনের অধিবেশনের সংক্ষিপ্তসার ৫০০ শব্দের মধ্যে বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে রিপোর্ট করা ছিল তাঁর কাজ।

প্রেম ভাটিয়া তখন স্টেটসম্যানের চিফ অব ব্যুরো। তাঁর নির্দেশ ছিল অধিবেশন সাদামাটা হলে অজিত ভট্টাচার্য একটি আলাদা রিপোর্ট লিখবেন। তার বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব থাকতে হবে।

তেমন বিষয় মিলবে কোথায়? পিছনের বেঞ্চ থেকে কোন সাংসদ হঠাৎ কোন চমকপ্রদ বক্তব্য পেশ করে সাদামাটা অধিবেশনেও রঙের ছোঁয়া লাগাতে পারেন। কোন মন্ত্রীর তুচ্ছ কোন ভুল থেকেও একটা ভাল খবরের খোরাক মিলে যেতে পারে।

দিল্লিতে নিযুক্ত বিভিন্ন বড় বড় কাগজের সংসদীয় সংবাদদাতারা অধিবেশনের দিকে নজর রাখেন কিন্তু

তার কোন সাধারণ রিপোর্ট পাঠান না। তাঁদের তরফে সে কাজটা করে পি টি আইয়ের রিপোর্টাররা। তাঁরা অধিবেশন চলাকালে কিছুক্ষণ বাদে বাদে অধিবেশনের রিপোর্ট টেলিপ্রিন্টার মারফৎ তাঁদের গ্রাহকদের কাছে পাঠাতে থাকেন।

রাজনৈতিক সংবাদদাতারাও বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কী ভাবে কাজ করেন তা Michael Dobbs তাঁর House of Cords নামে একটি রাজনৈতিক থ্রিলারে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তার কিছুটা অংশ আপনাদের জানাচ্ছি—

ধরুন ব্রিটেনে হাউস অব কমন্স বা সংসদের নির্বাচনের ফল ঘোষিত হল। দেখা গেল ক্ষমতাসীন দল আবার জিতেছে বটে কিন্তু তাদের গরিষ্ঠতা কমে গেছে। ভোটের আগের ১২০ আসনের গরিষ্ঠতা কমে ২০ তে নেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাগজের রাজনৈতিক সংবাদদাতারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করে গরম গরম খবর লেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা জানতে চান—

(১) বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনগ্রিস কি ফের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরতে পারবেন? সংসদীয় দল কি তাঁকে ফের নেতা বলে মেনে নেবে? নাকি আর কাউকে ডাকবে? তেমন হলে কার সম্ভাবনা বেশি? তিনি কি নবীন প্রজন্মের কোন সংসদ? নাকি কোন পোড়খাওয়া প্রবীণ রাজনীতিক? দলনেতা নির্বাচনের দৌড়ে কে কার থেকে কতটা এগিয়ে আছে?

(২) হেনরিকে সংসদীয় দল ফের নেতা মেনে নিলে মন্ত্রিসভার গঠন কেমন হবে? কারা ছাঁটাই হবেন? কাদের ভাগ্য প্রসন্ন হবে? মন্ত্রী এবং দপ্তরে বড় রকম ওলোট-পালট করা হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? মন্ত্রী না হতে পারায় বা শাঁসালো দপ্তর না মেলায় বিক্ষুব্ধ মন্ত্রী ও তাঁদের সমর্থকরা আয়ারাম গয়ারামের ভূমিকা নিয়ে হেনরির গদি উল্টে দিতে পারে কি না?

এই সব স্পর্শকাতর ও জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য টাটকা খবর সাতসকালে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে না পারলে খবরের কাগজের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। কিন্তু কে দেবে এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব? জবাব দিতে পারেন হেনরি স্বয়ং। কিন্তু তখন তিনি মফঃস্বলের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লন্ডনের পথে।

তিনি লন্ডনে ফিরে ওপরতলার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে মতবিনিময় করার পর তাঁর চিন্তাভাবনার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই।

কয়েক ঘণ্টা পরে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রীর নিবাস থেকে তাঁর প্রেস সচিব কর্তৃক প্রচারিত একটি সোজাসাপটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে এই বিষয়ে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হল। সেই বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হল, পুনর্নির্বাচিত সব মন্ত্রী ফের মন্ত্রী হবেন। তাঁদের সকলের দপ্তরও বহাল থাকবে। দলের প্রবীণ পদাধিকারীরা প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দিয়েছেন।

নতুন মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে ভাবি শাসকদলের এই নীতিগত ঘোষণা অনতিবিলম্বে সব কাগজ এবং সংবাদ সংস্থার দপ্তরে ঢেউ তুলল। কৌতূহলের ঢেউ। ওপরতলা থেকে রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের কাছে প্রবল তাগিদ এল, এই খবরের পিছনের খবর চাই। গুজব নয়, খাঁটি খবর। মনগড়া কল্পকাহিনীর লোক ঠকান ফাঁকিবাজি নয়, চাই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। The Daily Telegraph — দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের রাজনৈতিক সংবাদদাতা মিস ম্যাটি স্টোরিনও পত্রপাঠ যুদ্ধে লেগে গেলেন। কিন্তু সূত্র? কে দেবে ম্যাটিকে খবরের অন্তরালের

খাস খবর? পুনর্নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, দলের চেয়ারম্যান, একাদিক্রমে সপ্তমবার সংসদে নির্বাচিত গরিষ্ঠ নেতা মান্যবার স্যামুয়েল উইলিয়মস কেউই এই ব্যাপারে প্রেসের কাছে মুখ খুলবেন না। তাহলে উপায়? ম্যাটি ভাল করেই জানেন, উপায় একটা বার করতেই হবে। অতএব নানা দরজায় ধাক্কা মারলেন ম্যাটি। নানা লোকের বৈঠকখানায় ফোন বাজল তাঁর। কিন্তু সবই বিফল। কোথাও এতটুকু আলোর খোঁজ পাওয়া গেল না। তাহলে ম্যাটি কি হেরে যাবেন?

হাল ছেড়ে দেবার আগে মিস ম্যাটি আর একবার ফোন করলেন, বিদায়ী সরকারের প্রবীণ সংসদীয় মন্ত্রী এবং চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহার্টের বাড়িতে। ম্যাটি আগেও কয়েকবার ফ্রান্সিসকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনবারই কেউ সাড়া দেননি। এবারও ম্যাটির সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল।

তবুও ম্যাটি হাল ছাড়লেন না। গাড়ি হাঁকিয়ে হানা দিলেন ফ্রান্সিসের বাড়িতে। বাইরে থেকেই বোঝা গেল বাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। ম্যাটি দরজার কলিং বেল বাজালেন। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললেন ফ্রান্সিস নিজেই। তাঁর মনে হল, তরুণীটিকে আগে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর নাম বা পরিচয় কিছুই তাঁর স্মরণে এল না। তাই কিছুটা আশ্চর্য হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

— আমি টেলিগ্রাফের ম্যাটি। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। ভেতরে আসতে পারি?

— আমি দুঃখিত মিস। গত একটা মাস প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। আমি বড় ক্লান্ত। আপনি বরং পরে একদিন আসবেন। কেমন?

এই বলে ফ্রান্সিস তরুণী সংবাদ শিকারীটির প্রায় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ম্যাটি চট করে খোলা দরজার দুটি পাল্লার ফাঁকে তার ডান হাতটা একটু ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, মিঃ আর্কোহার্ট, আমি আজ বিকাল থেকে আপনার সঙ্গে ফোনে বা মুখোমুখি কথা বলার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একবারও সে সুযোগ পাইনি। আমি জানি আপনি খুবই ক্লান্ত। আপনার এখন বিশ্রাম নেওয়াও দরকার। আমার সঙ্গে কথা বলার এটা উপযুক্ত সময় নয়। তবুও আমি আপনাকে বিরক্ত করছি। আপনি শুধু আমাকে বলুন. বিদায়ী মন্ত্রীসভায় কোন নাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে আসল কারণটা কী?

— দুঃখিত, আমি কিছু বলব না। বলতে পারব না।

এই কথা শোনামাত্র ম্যাটি তাঁর তীর নিক্ষেপ করেন, তাই নাকি? দারুণ খবর। তবে আমার মনে হয়, খবরটা কাল সকালের টেলিগ্রাফে বেরলে আপনার সুবিধা হবে না।

মেয়েটার কথা শুনে ঝুনো রাজনীতিক ফ্রান্সিস হতবাক। বলে কী? কী দারুণ খবর? একটু দ্বিধা করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, খবরটা কী?

— কেন, মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে গত রাতে শাসকদলের ওপরতলায় প্রচণ্ড মতভেদ। কোনরকম রদবদলের সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী অসন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহার্ট। তিনি এবার আরও বড় দায়িত্ব পাবার জন্য আশা ও চেষ্টা করেছিলেন। ডাউনিং স্ট্রিট তার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নীতির সমর্থনে একটি কথাও বলতে চাননি।" আমার এই খবরটাই তো ছাপা হবে কালকের টেলিগ্রাফে।

ফ্রান্সিসের বিস্ময়ের সঙ্গে এবার যুক্ত হয় আতঙ্ক। জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সত্যসত্যই এই খবর লিখবে নাকি?

— কি যে বলেন স্যার। তাই কি লেখা যায়? এ সব তো বানানো গল্প। কিন্তু কি করব স্যার, কেউ আসল খবর না দিলে চাকরি বজায় রাখার জন্য দু'চার লাইন বানানো খবরই তো লিখতে হবে। ঠিক বলছি না স্যার? কেউ পর্দার আড়ালের খবর না দিলে সেটা জানার জন্য আমাকে তো ধ্যানে বসতেই হবে। আপনি আমাকে সত্য কথাটা না জানিয়ে ধ্যানে বসতে বাধ্য করছেন না কি? ধ্যানে না বসলে খবর বানাবার মালমশলা পাব কোথা থেকে?

ফ্রান্সিস এসব বোলচাল শুনে বুঝে গেলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। রিপোর্টারটাকে খবরের কিছু খোরাক না দিলে তাঁকে বিক্ষুব্ধ বলে দাগি করে দেবে টেলিগ্রাফে। সুতরাং মন্দের ভাল হিসাবে মেয়েটার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ গল্প করার পন্থাটাই বেছে নিলেন তিনি। তাই দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে ম্যাটিকে বললেন, ভেতরে এস।

ম্যাটিকে বৈঠকখানায় বসিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, কি জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর। আমি সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করব।

ফ্রান্সিসকে এত সহজে কাবু করে ফেলা যাবে তা ম্যাটি ভাবেনি। এখন ফ্রান্সিসকে নরম হতে দেখে ম্যাটি বুঝে গেল, সত্যসত্যই পর্দার আড়ালে একটি কিছু বড় গোলমাল আছে। তাতে একটা বড় ভূমিকা আছে ঘুঘু সংসদীয় মন্ত্রীর। অতএব ম্যাটি তার কাঁধের ব্যাগের ভেতর থেকে নোটবই বার করে। তাকে নোটবই বার করতে দেখে ফ্রান্সিস বলেন, না, না। কোন কথা নোট করা চলবে না। কথা হবে লবির আইন মেনে।

ব্রিটিশ সংসদের লবিতে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ। স্থানটি মন্ত্রী, এম পি এবং সংসদীয় ও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে প্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তার অলিখিত শর্ত, প্রয়োজনে প্রাপ্ত বিবরণ বা ভাষ্য সংবাদে ব্যবহার করা চলবে কিন্তু তার একটি অক্ষরও বক্তার মুখে বসান চলবে না। বক্তার পরিচয় প্রকাশ করাও মানা। কোন সাংবাদিক এই শর্ত অমান্য করলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী এবং এম পি'র মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সুতরাং খবরের দায়ে কোন সাংবাদিক লবি আইন ভাঙেন না।

ফ্রান্সিসের কথা মেনে নিয়ে ম্যাটি নোটবইটি আবার ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিলেন। লবির আইনে দুজনের কথা এগোল এইভাবে।

ফ্রান্সিস বললেন, আমরা নতুন সরকার গড়ার পর একটুও দেরি না করে কাজে নেমে পড়তে চাই। নতুন মন্ত্রী এবং পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর অদলবদল করলে তাতে প্রথম প্রথম প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি হবে। নতুন মন্ত্রীরা দায়িত্ব বোঝার জন্য সময় নেবেন। পুরান মন্ত্রীদের নতুন নতুন দফতরে পাঠালে তাঁর একই সমস্যায় পড়বেন। তাই আমরা পুরান ব্যবস্থাই বহাল রাখছি। এই হল প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের নেপথ্যের কারণ।

ম্যাটি বুঝল, ফ্রান্সিস চালাকি করছেন। তাই সে বলল, এতো ডাউনিং স্ট্রিটের বক্তব্যের রেকর্ড বাজালেন আপনি। এর জন্য লবির আইন মানার দরকার কি? তাহলে ভোট প্রচারে আপনাদের বক্তব্যের কী পরিণতি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি, আপনারা সবাই বলেছিলেন, নতুন উদ্যম, নতুন স্বপ্ন, নতুন রক্ত হবে আপনাদের নতুন সরকারের চালিকা শক্তি। বলেননি? তাহলে ভোটের পর পুরানো বোতলে পুরানো মদ কেন? নতুন খেলোয়াড়দের দিয়ে নতুন করে দল গড়ে কেন মাঠে নামার সাহস পেলেন না প্রধানমন্ত্রী? আপনাব বক্তব্যে আমার এইসব প্রশ্নের কোন জবাবই মিলল না। মন খুলে বলুন তো, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই কি মন্ত্রীসভা গড়ার শ্রেষ্ঠ উপায়?

— তুমি কি করে ভাবলে আমি অন্য কিছু বলব? আমি সরকারের চিফ হুইপ। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি পুরো আনুগত্য এই পদের প্রধান শর্ত। সুতরাং তিনি যা চান তার প্রতি আমার সমর্থন ছাড়া আর কি থাকবে?

— সে তো ঠিক মিস্টার চিফ হুইপ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপনার আনুগত্যের এবং নতুন মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে তাঁর নীতির প্রতি আপনার সমর্থনের পূর্ণ বিবরণ ঠিকঠাক থাকবে। কিন্তু মিস্টার আর্কোহার্ট কি বলেন? পুরান দফতরে পুনর্বহাল হয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি সফল হল? আপনার জবাব আমি লবির আইন মেনেই লিখব। আপনার আমার এই আলোচনা তৃতীয় কেউ কোনদিন জানবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনি তাতে খুশি হননি।

— তাহলে শোন, তোমার অনুমান কিছুটা ঠিক। আমি এতে সন্তুষ্ট নই। শুধু আমি নয়, পুরান মন্ত্রীরা সবাই অসন্তুষ্ট। কারণটা খুব সহজ। পুরান মন্ত্রীরা সবাই ওপরে উঠতে চায়। আরও ক্ষমতার জন্য সবাই পাগল। সবাই চায় বিদেশ, জাহাজ, খনি, স্বরাষ্ট্র দফতরের মত বেশি বাজেটের বিভাগ। বেশি বাজেট মানে বেশি কর্তৃত্ব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি কাউকে কাউকে তাদের পছন্দসই বিভাগ দিতে চান তো অন্যের মুখের গ্রাস কাড়তে হবে। তাতে এই রকম স্বল্প গরিষ্ঠতার সরকারে বড় রকম ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর গদি টলে যেতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তিনি কোনরকম রদবদলের ঝুঁকি নেবার সাহস করলেন না।

— তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে নির্বাচনের ফল বেরতেই সরকারি দলে ক্ষমতার লড়াই, ল্যাং মারামারি, খেয়োখেয়ি আরম্ভ হয়ে গেছে?

— ব্যাপারটা এইভাবে বলা যায়। অন্যভাবেও দেখা যায়। অনেক মন্ত্রী ও সাংসদ সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাঁরা ভাবছেন, এত কম গরিষ্ঠতা এবং দুর্বল প্রধানমন্ত্রী এই সরকারকে পুরো মেয়াদ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কিনা। অনেকেরই আশঙ্কা, তা সম্ভব নয়। দেড় দু'বছরের মধ্যে সংসদের অন্তর্বর্তী নির্বাচন নিয়েও একটা উত্তেজনা আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীও সেটা টের পেয়েছেন। তাই তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রেখে গদি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

— তার মানে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পুরো টিম নেই?

— ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে।

— তাহলে গোলমেলে মন্ত্রীদের তিনি ছেঁটে ফেলছেন না কেন?

— ওই যে বললাম, ভয় পাচ্ছেন। তাই গোলমেলে মন্ত্রীদের হজম করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের সংখ্যা তো কম নয়।

— এই অবস্থায় তিনি মন্ত্রীসভা গড়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই কী শ্রেষ্ঠ পন্থা?

— আমি যদি টাইটানিকের ক্যাপ্টেন হতাম তাহলে সামনে এক বিরাট হিমশৈলকে এগিয়ে আসতে দেখলে বলতাম না, সবাই তৈরি হন, আমরা ডুবতে চলেছি।

— তার বদলে আপনি কি করতেন?

— আমি হিমশৈলটাকে পাশ কাটিয়ে বিপদ কাটাবার শেষ চেষ্টা করতাম।

— প্রধানমন্ত্রীকে আপনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন?

ফ্রান্সিস বললেন, ম্যাটি, অনেক বলেছি, আর একটি কথাও নয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে চিফ হুইপ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কি বলেছেন বা বলেননি সেটা লবির আইন মেনেও বলা যায় না। এবার তুমি চট করে উঠে পড়, কেমন?

— আর মাত্র একটা প্রশ্ন। পার্টির চেয়ারম্যান আজ সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন। তিনি কি চান?

— তিনি তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসভাজন তরুণ প্রজন্মের কোন মন্ত্রীকে নতুন দলনেতা করে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে চান। নিশ্চয় জানতে চাও তিনি কে? নিজের বুদ্ধি থাকলে বুঝে নাও তিনি কে হতে পারেন। দয়া করে এবার সত্যসত্যই যাও। আমি খুব ক্লান্ত।

ম্যাটি চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মাইকেল স্যামুয়েল?

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে বৈঠকখানার দরজা খুলে দেন।

পরদিন টেলিগ্রাফের প্রথম পাতায় রাজনৈতিক সংবাদদাতা ম্যাটি স্টোরিনের নামাঙ্কিত খবরটি ছিল এই রকম—

মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহের মুখে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ম্যাটি স্টোরিন

১৪ জুন : নির্বাচন পরবর্তী মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনগ্রিজ পরস্পরবিরোধী চাপের মুখে পড়েছেন। কয়েকজন নবীন সাংসদ মন্ত্রী হতে জোরদার লবি করছেন। অন্যদিকে কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী আগের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব আশা করছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সকলকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় তিনি পুরান মন্ত্রিসভার বিজয়ী সদস্যদের সকলকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুনর্নির্বাচিত সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোয়াট ওই সিদ্ধান্তকে জোরাল সমর্থন জানিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে, চিফ হুইপ দলের সাংসদদের বোঝাচ্ছেন, এখন ক্ষমতার জন্য ইঁদুর দৌড়ের সময় নয়, পূর্ণ উদ্যমে কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময়।

কিন্তু শাসক দলের অন্দরমহলে ভিন্ন মতও মাথা চাড়া দিয়েছে। একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী নতুন দলনেতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সরকারকে পুরো মেয়াদ টেঁকাবার জন্য চেষ্টা করতে চায়। নতুন দলনেতার পদে কে যোগ্যতম প্রার্থী হতে পারেন তা নিয়ে বিচার বিবেচনা পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে।

এই ব্যাপারে দলের চেয়ারম্যান লর্ড উইলিয়ামস যার দিকে ঝুঁকবেন সে দিকেই পাল্লা ভারি হবে। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মাইকেল স্যামুয়েল। সুতরাং দলনেতার পদে আশু বা অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মিস্টার স্যামুয়েলকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিরোধী দলের মুখপাত্র বিজয়ী দলকে টাইটানিক এবং প্রধানমন্ত্রীকে তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শাসকদলের ঘরের মধ্যে আগুন ধরে গেছে। তা নেভাবার শক্তি বা সমর্থন কোনটাই প্রধানমন্ত্রীর হাতে নেই। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিস্থিতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এবার বিদেশে নিযুক্ত কোন বিশেষ সংবাদদাতাকে কী রকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে খবর যোগাড় ও সরবরাহ করতে হয় তা আমরা দেখব।

ধরা যাক, মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশের রাজধানীতে উইক এন্ডের রাতে একটি বড় ঘটনা ঘটল। সেই রাজধানীতে নিযুক্ত কোন বৈদেশিক সংবাদদাতা তখন কী করবেন? জন গ্রিসাম তাঁর 'দ্য ব্রেদরেন' নামে উপন্যাসে এই রকম একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেই সাংবাদিককে খবর দেবার তখন কেউ নেই। তাই বলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না। তাঁর খবর—

"আমেরিকান দূতাবাসে একটি সান্ধ্য পার্টি চলাকালে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ। রাত তখন দশটা কুড়ি। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে কোন সরকারি তথ্য নেই। তবে সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই অনেক। দূতাবাস এলাকাটি সেনা জওয়ানরা ঘিরে রেখেছে। এই বোমা বিস্ফোরণের দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে এ কাজ —এরা, এরা অথবা —এরা করে থাকতে পারে। এগুলি সবই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠন।"

সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিভাবে একটি সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট লেখা যায় এই কাল্পনিক সংবাদটি তার একটি উত্তম উদাহরণ। অভিজ্ঞতা ও উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তিনি এই রিপোর্টটি লিখেছিলেন।

এ থেকে আমরা বুঝলাম, যেখানে ঘটনার বিবরণ দেবার জন্য কেউ নেই অথচ সংবাদটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ প্রতিনিধিকে কর্তব্য পালন করতে হয়। ডেডলাইনের (Deadline)-এর মধ্যে তাঁর খবর প্রকাশনা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হয়। এর জন্য তাঁকে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিন্তু সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়। অনুমানের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে তিনি গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে দিলে তিনি নিজে এবং তাঁর কাজ দুই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে হাসির খোরাক হবে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এক্ষেত্রে 'ডেডলাইন' কথাটি কী তাৎপর্য বহন করছে।

প্রকাশনার কেন্দ্রের বাইরে থেকে যারা খবর পাঠান বা বিশেষ কোন খবর যোগাড় করার জন্য কেন্দ্র থেকে যাদের বাইরে পাঠান হয় সেই সব সংবাদদাতা বা রিপোর্টারদের কাছে ডেডলাইন কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর যোগাড় করা খবর ডেডলাইন পার হবার যথেষ্ট আগে ডেস্কে না পৌঁছলে সে খবর পরবর্তী সংস্করণে ছাপা যায় না। কারণ, ডেডলাইন পার হওয়া মাত্র কাগজ চিফ সাব ছাপতে বলে দেন। ফলে রিপোর্টারের খাটুনি এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল দুইই বরবাদ হয়। খবরটি কাগজে ধরাতে না পারার দরুন পাঠকরা তা থেকে বঞ্চিত হন।

আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Wisconsin) অধ্যাপক ব্রুস ওয়েস্টলি (Bruce Westley) বলেছেন, ডেডলাইন হল, "The last moment at which copy may be accepted in order to meet a particular edition."

উদাহরণ সহকারে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। ধরুন, মুর্শিদাবাদ জেলার আহিরণের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে পড়ে গেল। কলকাতার একটি কাগজ সেই খবর জানল বিকাল চারটায়।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ চিফ রিপোর্টার একজন পাকা রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারকে গাড়ি করে দুর্ঘটনাস্থল রওনা করে দিলেন। নানা কারণে তাঁদের গাড়ি যখন বহরমপুরে ঢুকল তখন রাত ১১টা।

বহরমপুর থেকে গাড়িতে আহিরণ যেতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ রাত সাড়ে ১২টার আগে তাঁদের আহিরণ পৌঁছান সম্ভব নয়। দুর্ঘটনাস্থলে তাঁদের কমসে কম আধঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। তার পরে সেখান থেকে বহরমপুর রওনা হতে হতে রাত একটা বাজবে। বহরমপুরে তাঁরা যখন ফিরবেন তখন রাত আড়াইটা বেজে যাবে। ওদিকে শহর সংস্করণে ছাপার জন্য খবর প্রিন্টারের হাতে রাত দুটোর মধ্যে না পৌঁছলে খবর বরবাদ।

সুতরাং রিপোর্টার সে বোকামি না করে বহরমপুরেই সাময়িক যাত্রা বিরতি করলেন। সবার আগে চলে গেলেন সরকারি এমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুমে। সেই কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছে জেলাশাসকের দফতরের একটি বড় ঘরে। কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে রয়েছেন একজন সহকারী জেলাশাসক। দুর্ঘটনাস্থলের সঙ্গে তাঁর রেডিও টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে চৌকশ রিপোর্টার বহরমপুরে বসেই আহিরণের অবস্থার প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করে ডেডলাইনের অনেক আগেই দফতরে খবর পাঠিয়ে দিলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার আহিরণে অনেক কাজ করে ও ছবি তুলে সেই বহরমপুরেই ফিরলেন। আহিরণ থেকে কলকাতায় খবর পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। বহরমপুর থেকে তাঁর ফোন কলকাতায় চিফ সাব ধরে বললেন, কাগজ ছাপা শুরু হয়ে গেছে। আজ বরং তোমরা কোথাও বিশ্রাম নাও। কাল দেখা হবে।

ডেডলাইনকে মান্য না করলে রিপোর্ট এবং রিপোর্টারের এই দশাই হয়ে থাকে।

এবার আমাদের আলোচনার মধ্যে আসছেন সমর সংবাদদাতা (War Correspondent)। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। যুদ্ধের রিপোর্ট করতে যারা ফ্রন্টলাইনে এগিয়ে যান তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর ঘরে ফেরেন না। এমনই ঘটেছে ২০০১ সালে আফগানিস্তানের যুদ্ধে।

তালিবান উচ্ছেদের যুদ্ধের তাজা খবর সংগ্রহ করতে যারা আফগানিস্তানের রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফিরেছেন। ফেরেননি আটজন। তালিবান অধিকৃত অঞ্চলে সাংবাদিকরা ছিল অবাঞ্ছিত। তালিবান যুদ্ধবাজদের চোখে সাদা চামড়ার সাংবাদিক মানেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। আর গুপ্তচরের শাস্তি একটাই— মৃত্যু।

অথচ খবর চাই, যুদ্ধের টাটকা, তাজা, চোখে দেখা খবর। সেই অমূল্য নিধির সন্ধানে ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর উত্তরের জোটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এগোচ্ছিলেন একদল সাংবাদিক। হঠাৎ তাঁরা পড়ে যান তালিবান যোদ্ধাদের গুলির মুখে। এই হামলায় নিহত হন (১) রেডিয়ো ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনালের শ্রীমতি জোহানি সাটন — Johane Sutton, আর টি সি রেডিয়োর পিয়েরে বিলাড — Pierre Billad, জার্মানির স্টার্ন ম্যাগাজিনের ভোলকার হ্যান্ডলাইক — Volkar Handloik।

এই ঘটনার পরেও সাংবাদিকের দল রণক্ষেত্র ছাড়লেন না। জোহানি, পিয়েরে এবং ভোলকার নিহত হবার এক সপ্তাহ পরে ১৯ নভেম্বর জালালাবাদ-কাবুল সড়ক ধরে কয়েকজন দুঃসাহসী সাংবাদিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তালিবান দস্যুর দল প্রেসের গাড়ি থামিয়ে চারজন সাংবাদিককে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে। তারপর পাথর দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে তাঁদের চরম যন্ত্রণা দেয়। অবশেষে সেই অর্ধমৃত সাংবাদিকদের গুলি করে মেরে ফেলে তালিবান ঘাতকরা। তাঁরা হলেন রয়টার্সের অস্ট্রেলিয়ান ক্যামেরাম্যান হ্যারি বার্টন — Harry Burton, পাকিস্তানে কর্মরত রয়টার্সের ক্যামেরাম্যান আজিজ হায়দারি, মিলানের খবরে কাগজ কোরিয়ের ডেলা সেরা-র (Corriere della Serra) সাংবাদিক শ্রীমতি মারিয়া গ্রাজিয়া কুটুলি — Maria Grazia Cutuli এবং মাদ্রিদের এল মুনডো (El Mundo) কাগজের রিপোর্টার জুলিয়ো ফুয়েন্টেস — Julio Fuentes।

তারপর ২৭ নভেম্বর আফগানিস্তানের তালোকান (Taloqan) শহরে খুন হন উলফ স্ট্রমবার্গ (Ulf Stromberg)। তিনি এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক ওই শহরের একটি বাড়িতে বাসা নিয়ে কাজ করছিলেন। ডাকাতরা সেই বাড়িতে ঢুকে স্ট্রমবার্গের বুকে গুলি করে তাকে খুন করে।

আফগানিস্তানে তখন যুদ্ধের খবর যোগাড় করে তা প্রকাশনা বা সম্প্রচার কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য এলাহি আয়োজন করতে হয়েছিল। রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান, টেলিভিশনের জন্য ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান তো বটেই সেই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অনুবাদকদেরও দলে নিতে হয়েছিল। অনুবাদক ছাড়া কো বুঝবে স্থানীয় ভাষা ও উপভাষার কথাবার্তা? এবিসি নিউজের দলে ছিলেন সাংবাদিক ও কর্মী মিলিয়ে নয়জন মানুষ। তাঁদের দলপতি ছিলেন জিম উটেন — Jim Wooten।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দলে দলে সাংবাদিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে জড়ো হচ্ছিলেন আফগানিস্তানের জালালাবাদে। তাঁদের সকলের লক্ষ্য তোরাবোরা অথবা কাবুল।

কাবুলে তালিবানদের আত্মসমর্পণ আসন্ন; তোরাবোরায় ওসামা বিন লাদেনের সন্ধান। কিন্তু কেউ কাউকে নিজের মতলব ভাঙছেন না। জালালাবাদের একমাত্র সরাইখানায় জিম উটেনের সঙ্গে মোলাকাত হয় গেল ওয়াশিংটন পোস্টের কিথ রিচবার্গের (Keith Richburg)। জিমকে হ্যালো, হাই করে কিথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

জিম বললেন, আপাতত এখানেই।

দিনটা ছিল ১৮ নভেম্বর। পরদিন সকলে যে যার যানবাহনে লটবহর ভরতি করে রওনা দিলেন কাবুলের দিকে। জিমের দলে নয়জন কর্মীর মধ্যে ছিলেন তিনজন প্রোডিউসার, দুজন ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান, দুজন অনুবাদক, গাড়ির চালক এবং জিম স্বয়ং। লটবহরের মধ্যে ছিল বই, মানচিত্র, ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, বিছানা, পিঠে ঝোলান বোঁচকা, ক্যামেরা, ক্যামেরা বসাবার তেপায়া, আলোর সরঞ্জাম, মাইক্রোফোন, অডিয়ো মিক্সচার, ফিউস, ব্যাটারি, চার্জার, জেনারেটার, ভিডিয়ো টেপ, স্যাটেলাইট ভিডিয়ো ফোন, খাবার, জল, ইলেকট্রিক তার ইত্যাদি। এবিসি নিউজের ভাড়া করা গাড়িতে যাত্রীর থেকে তখন মালপত্রই বেশি। তারই মধ্যে ঠাসাঠাসি করে এবিসি নিউজের ইউনিট চলল কাবুল। জালালাবাদ থেকে কাবুল গাড়িতে তিন ঘণ্টার পথ। ওই পথে তখন গাড়ি বলতে শুধুই 'প্রেস'।

এবিসি'র দক্ষিণ আফ্রিকান ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান টিম ম্যানিংকে জিম বলে দিয়েছিলেন, পথে জীবন্ত কিছু দেখলে ছবি তুলে নেবে। কিন্তু পথ তো জনশূন্য। ছবি তোলার উপাদান কোথায়? হঠাৎই ক্যামেরাম্যান চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলল। তার কথায় গাড়ি থামালো চালক। টিম নেমে গেল ক্যামেরা বাগিয়ে। তার ক্যামেরার চোখ কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ের দিকে। তারা কয়েকটি অবাধ্য উটকে ঠিকানায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত মেয়েরাই জিতল। উটগুলি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল একটি টিলার আড়ালে।

ইতিমধ্যে তাদের থেমে থাকা গাড়িকে পেরিয়ে অন্যান্য সাংবাদিকদের গাড়ি এগিয়ে গেল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে। ধুলো থিতোবার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করল এবিসি নিউজের গাড়ি। সেই ফাঁকে টিম দেখল, একজন লোক একটি দলছুট ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পালের দিকে। টিমের ক্যামেরায় সেই দৃশ্যেরও কিছুটা অংশ বন্দি হল।

এইসব পর্ব মিটিয়ে এবিসি'র গাড়ি আবার চলতে শুরু করল কাবুলের পথে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আর একটা গাড়ি ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে এবিসি নিউজের গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর গাড়ির সামনের আসন থেকে এক যাত্রী নেমে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওদিকে আর এগিয়ো না। ওদের মেরে ফেলেছে। তোমরা গেলে তোমাদেরও মেরে ফেলবে।

লোকটি আফগান। তাকে শান্ত করে জানা গেল, তালিবান ঘাতকরা টাঙ্গি আব্রিসাম গ্রামের কাছে তিনটি গাড়ি থামিয়ে পাঁচজন বিদেশি সাংবাদিককে পিটিয়ে, পাথর দিয়ে থেঁতলে এবং গুলি করে মেরে ফেলেছে। পরে জানা গেল, পাঁচজন নয়, চারজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন সেই গ্রামে। স্থানটি থেকে কাবুল মাত্র ৫০ মাইল দূরে। পঞ্চম সাংবাদিক এপি'র ক্যামেরাম্যান খালিদ কাজিহা (Khalid Kazziha) কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছে।

ওদিকে টাঙ্গি আব্রিসাম গ্রামের কঠিন প্রান্তরে সারা রাত পড়ে রইল নিহত চার সাংবাদিকের মরদেহ। কিন্তু যেসব সাংবাদিক বেঁচে ছিল মৃত সহকর্মীদের জন্য শোক করার, চোখের জল ফেলার অবকাশ তাদের ছিল না। জালালাবাদে ফিরে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সাংবাদিক নিধনের এই খবর যে যার কেন্দ্রে পাঠাতে।

রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সমর সংবাদদাতাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হয়? কোন কোন বিশেষ গুণ থাকলে একজন দক্ষ সমর সংবাদদাতা হওয়া যায়?

এই দুটি প্রশ্নে ফরাসি ঔপন্যাসিক জুল ভের্ণ তাঁর মাইকেল স্টগফ : রাশিয়ার রাজদূত উপন্যাসে উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। ১৮৭৬ সালে তিনি উপন্যাসটি লিখেছিলেন।

উপন্যাসের দুটি আকর্ষণীয় পার্শ্ব চরিত্র দুই রিপোর্টার। একজন ইংরেজ, অন্যজন ফরাসি। প্রথমজন লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার। দ্বিতীয় কোন কাগজের লোক তা প্রকাশ করে না। কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করলে রহস্যের ভঙ্গিতে বলে, আমার বোন ম্যাডালিন, তার পক্ষ থেকে আমি সংবাদ শিকার করি। ইংরেজ সাংবাদিকের নাম হ্যারি ব্লাউন্ট, ফরাসি সাংবাদিকের নাম অলসাইড জোলিভেট। মস্কোয় ক্রেমলিন প্রাসাদে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে এইভাবে—

"তাদের চারদিকে নিত্য যা-কিছু ঘটছে কিছুই তাদের এড়িয়ে যেতে পারে না। ফরাসি লোকটির সদাজাগ্রত দৃষ্টি, এবং ইংরেজ ভদ্রলোকটির সকল ব্যাপারে কানদুটি সজাগ রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা। একজনের চোখে পৃথিবীর সবকিছুই যেন ধরা পড়ে এবং অপরজনের কানের কাছে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর সকল রকম গোপন মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, ভালমন্দ ব্যাপার।

সাংবাদিক হিসাবে সংবাদ শিকারে তারা দুজনেই অতিরিক্ত উৎসাহী। কোন সূত্র পাওয়া গেল কি— অমনি তারা সচকিত হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ এবং সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে তারা কোন রকম বিপদ-আপদকেই গ্রাহ্য করে না, কিছুতেই বিচলিত হয় না। ঘোড়দৌড়ের জকি যেমন বাজিমাত করার জন্যে মরি-বাঁচি করে ঘোড়া ছুটোয়, কর্তব্যের ডাকে তাদেরও ছিল তেমনি মরি-বাঁচি মনোভাব।"

ক্রেমলিনে এক সান্ধ্য উৎসবে তাদের দুজনের মোলাকাত হল। অলসাইড বললেন, বোনকে আগেই জানিয়েছি, "এই বিরাট উৎসব গৃহের ভেতর এক টুকরো অদৃশ্য মেঘ ঘনিয়েছে; তারই কালো ছায়া পড়েছে মহামান্য জাজের মুখের ওপর।"

হ্যারি বিষয়টা টের পেলেও প্রথমে লুকোতে চেষ্টা করল। বলল, কোথায় দেখলে কালো ছায়া? আমার কাছে তো বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়।

হ্যারি ব্লাউন্টের চালাকি অলসাইড জোলিভেটের চোখ এড়াল না। হাসিমুখে সে বলল, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ডেলি টেলিগ্রাফের পাতায় উজ্জ্বল ভাষায় চালানো তোমার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

হ্যারি ব্লাউন্ট দমে গেল। বুঝতে পারল বৃথা চেষ্টা। তাই সে বলল, তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, বিদ্রোহী দল সীমান্ত ও ইরকুটসক প্রদেশের টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে জানার পরও তিনি কেমন নির্বিকার ছিলেন।

অলসাইড এবার হো-হো করে হেসে উঠল, "ওহো, তা হলে তুমিও জেনে ফেলেছ?"

হ্যারি বলল, "নিশ্চয়।"

এবার আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাংবাদিকের দেখা পাব মস্কো-নিজনি নভগরড ট্রেনের দুটি কামরায়। দুজনেরই কানে যাচ্ছিল কামরার যাত্রীদের এলোমেলো কথাবার্তা। যাত্রীদের বেশির ভাগই ব্যাপারী। তারা চলেছে নিজনি-নভগরডের মেলায়।

একটি কামরার যাত্রী অলসাইড জোলিভেট আলাপ জমিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে খবরের রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হল। যাত্রীরা ভাবল, লোকটা হয়ত স্পাই। সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখে কুলুপ এঁটে দিল।

জোলিভেট তাতে দমলেন না। চুপিসাড়ে নিজের ডায়েরিতে খবর লিখে ফেললেন।

যাত্রীরা ভারি সতর্ক। যুদ্ধের আলোচনায় খুব হুঁশিয়ার।

হ্যারি ব্লাউন্ট কিন্তু মুখটি বুজে যাত্রীদের কথা শুনে যাচ্ছে। তারা সবাই তাতার বিদ্রোহের টাটকা খবর নিয়ে আলোচনায় মত্ত। ব্রাউন্ট তাল বুঝে নোট করলেন, সহযাত্রী ব্যবসায়ীরা ভারি উদ্বিগ্ন। যুদ্ধের কথা ছাড়া তাদের মুখে অন্য কথা নেই।

এইভাবে দুই রিপোর্টার নানা বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে পৌঁছলেন ওমস্কের ভলিভান শহরের ফ্রন্টলাইনে। সেখানকার টেলিগ্রাফ অফিস থেকে হ্যারি ব্লাউন্ট লন্ডনে ডেলি টেলিগ্রাফে খবর পাঠালেন।

রাশিয়ান ও তাতার বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ। রাশিয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও নিদারুণ ক্ষতি। তাতারদের কামানের গোলায় দুটি গির্জায় আগুন লেগে গেছে। সে আগুন লকলকে শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ দিকে।

ব্লাউন্টের পর প্যারিসে খবর পাঠালেন অলসাইড জোলিভেট, লোকজন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। রাশিয়ানরা পরাজিত। তাদের তাড়া করেছে তাতার সেনা। একটি ছয় ইঞ্চি গোলা এইমাত্র টেলিগ্রাফ অফিসের দেওয়াল ভেঙে দিল। এমন গোলা আরও বিস্ফোরিত হতে পারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গুলি লেগে পড়ে গেলেন লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদদাতা হ্যারি ব্লাউন্ট। এমন বিপদেও অবিচলিত অলসাইড জোলিভেট খবর পাঠিয়ে যাচ্ছেন, গুলি লেগে ডেলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা হ্যারি ব্লাউন্ট এইমাত্র আহত হয়ে পড়ে গেলেন।

খবরের এই অংশটুকু পাঠিয়েই টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানিবাবু ঘোষণা করলেন, না আর হবে না। লাইন কেটে গেল।

এই না বলে কেরানিবাবু আলনা থেকে টুপিটি পেড়ে জামার আস্তিন দিয়ে দু'বার ঝেড়ে জানলা ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাই দেখে আহত হ্যারিকে কাঁধে তুলে চম্পট দেবার চেষ্টা করলেন অলসাইড জোলিভেট। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে একদল তাতার বিদ্রোহী হুড়মুড় করে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকে পড়ে বন্দি করল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিপোর্টারকে।

রাশিয়ার রাজদূতের অভিযান শেষ হল তাতার বিদ্রোহীদের পরাজয়ে। বিজয় উৎসবের সমারোহের খবরও হ্যারি ব্লাউন্ট এবং অলসাইড জোলিভেট বিশদভাবেই পাঠালেন তাঁদের অফিসে।

তারপরেই তাঁদের কাছে নির্দেশ এল, পিকিঙ রওনা হও। সেখানে একটা জটিল সমস্যার জট পাকিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর সংগ্রহের নেশায় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী হাত ধরাধরি করে রওনা দিলেন চিনে।

৫.২.৯ অবর সম্পাদক

এই অনুচ্ছেদে আমরা Sub-Editor কে অবর সম্পাদক না বলে সাব-এডিটর বলেই উল্লেখ করব। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Sub-Editor means a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions."— অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খবর গ্রহণ করেন, ছাপার জন্য খবর বাছাই করেন, খবর ছোট করেন, তার সারাংশ লেখেন, সম্প্রসারিত করেন, তরজমা করেন, সম্পাদনা করেন, খবরের শিরোনাম লেখেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি কাজ অথবা সবগুলি কাজ করেন, তিনি সাব-এডিটর। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ না থাকলেও প্রয়োজনে কপি নতুন করে লিখতে পারেন সাব-এডিটর।

সাব-এডিটরের কাজের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাব-এডিটরের কাজ খবর গ্রহণ করা। স্টাফ রিপোর্টার বা স্থানীয় সংবাদদাতারা যে সব খবর পাঠান তা সবই সাব-এডিটরের হাতে পৌঁছয়। প্রতিদিন তাঁর হাতে নানা বিষয়ে অনেক খবর আসে। তাঁকে সেগুলি পড়তে হয়। প্রথম দফার পড়ার উদ্দেশ্য হল পরদিনের কাগজের জন্য কোন কোন খবর নেবেন তা বাছাই করা। খবরের গুরুত্ব এবং তা কখন ঘটল ও কোন সময়ে তা ডেস্কে পৌঁছাল তা বিচার করে ছাপার ব্যাপারে খবরের অগ্রাধিকার স্থির করেন সাব-এডিটর। সাধারণত বাসি খবর ও এঁটো খবর তিনি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নির্বাসন দেন। দিনের খবর দিনের মধ্যে না এলে বাসি হয়ে যায়। অন্য কাগজে আগেই বেরিয়ে যাওয়া খবর এঁটো খবর বলে বিবেচিত হয়।

রিপোর্টারের লেখা খবর সাব-এডিটরের পছন্দ না হলে তিনি তা নতুন করে লেখেন (Rewrite)। নতুন করে লেখার পর যা দাঁড়ায় তা রিপোর্টারের পছন্দ না হতেও পারে। তেমন অবস্থা প্রায়ই হয়। তাই রিপোর্টারের সঙ্গে সাব-এডিটরের বন্ধুত্ব হওয়া শক্ত।

রিপোর্টারের কপি পড়ে সাব-এডিটর মনে করতে পারেন, রিপোর্টার খবরটি ঠিকভাবে লিখতে পারেননি।

মুখবন্ধ ঠিক হয়নি। বিশদ বিবরণেও নানা অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর বিবরণ ও ব্যক্তিগত মন্তব্য অনুপ্রবেশ করেছে। তার ওপর এই খবরটির যতটা স্থান প্রাপ্য তার থেকে লেখাটি বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় রিপোর্টারের কপিটি সাব-এডিটর নতুন করে লিখে ফেলেন। সেটাই তাঁর কাজ। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। নিচে উদ্ধৃত খবরটি মন দিয়ে পড়ুন—

পরীক্ষককে ফাঁসাতে ছাত্রীর খাতা লোপাট

হিংসা অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ যাই হোক, তা মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই ঘটনা হতেই পারে। পরীক্ষক শিক্ষিকাকে জব্দ করতে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আস্ত খাতা লোপাট করে দিয়ে 'দারুণ' এক চাল চেলেছিলেন প্রধান পরীক্ষক। ফাঁসিয়েও প্রায় দিয়েছিলেন পরীক্ষককে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধরা পড়ে গিয়েছেন প্রধান পরীক্ষক। পরীক্ষার্থীও পেয়েছে তার প্রাপ্য নম্বর। সেই প্রধান পরীক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়েছে পর্ষদ। সভাপতি হরপ্রসাদবাবু জানিয়েছেন, 'ইংরেজির প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষকুমার দাসকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইতিমধ্যেই আমরা দিয়েছি। সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে। এরপরও উনি উত্তর না পাঠালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব।' এই ঘটনা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রশাসনের সব স্তরেই সভাপতি কথা বলছেন। অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষবাবু বলেছেন, 'এনিয়ে আমি কিছু বলব না। যা বলার পর্ষদ বলবে।'

পর্ষদের কথায়, অভিনব ঘটনা। বিগত ৫২ বছরে এরকম ঘটনার নজির খুবই কম আছে। বারাসতের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বচ্ছশিলা বসুর কাছে ২০০২ সালের মাধ্যমিকের ইংরেজি পত্রের খাতা গিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বচ্ছশিলাদেবী খাতা দেখে জমা দেন প্রধান পরীক্ষকের কাছে। নিয়মানুযায়ী কত খাতা জমা দিলেন আর 'রিসিভ কপি' তুলে দিতে হয় পরীক্ষকের হাতে। কিন্তু স্বচ্ছশিলাদেবী পর্ষদকে যা জানিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে বারবার চাওয়ার পরও প্রধান পরীক্ষক তা দেননি। এরপরই দিন সাতেক বাদে প্রধান পরীক্ষক স্বচ্ছশিলাদেবীকে ফোন করে বলেন, একটা খাতা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। স্বচ্ছশিলাদেবীর কাছে থেকেই নাকি খোয়া গিয়েছে। একাধিকবার ফোন করেই তাঁকে এই কথা বারবার বলেন প্রধান পরীক্ষক।

এরই মধ্যে নম্বরের তালিকা অথবা 'অ্যাওয়ার্ড লিস্ট' প্রধান পরীক্ষক জমা দিয়ে আসেন পর্ষদে। এখানেও একটু অসততার আশ্রয় নেন প্রধান পরীক্ষক। প্রত্যেক প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক এবং ট্যাবুলেটরের কাছেই কম্পিউটারে তৈরি রোল নম্বর ছাপানো অ্যাওয়ার্ড লিস্ট পাঠানো হয়। তাতেই নম্বর লিখে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক হাতে লেখা অ্যাওয়ার্ড লিস্ট জমা দেন পর্ষদে। স্বচ্ছশিলাদেবী যে খাতাগুলি দেখেছিলেন তার একটার পাশে লেখা ছিল 'নট ফাইন্ড'। অর্থাৎ খাতা হারিয়ে গিয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে স্বচ্ছশিলাদেবী গোটা ঘটনা জানিয়ে চিঠি দেন পর্ষদে। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় মেদিনীপুরের শালবনী নীচু নৌসারি গালর্স হাইস্কুলের তন্দ্রা বসুর ফলাফল অসমাপ্ত। মার্কশিটে ইংরেজিতে লেখা অনুপস্থিত।

শুরু হয়ে যায় হৈচৈ। সভাপতি দু'জনকেই ডেকে পাঠান। পরীক্ষক আসল অ্যাওয়ার্ড লিস্ট জমা দেওয়ার পরই দেখা যায় তন্দ্রা বসু আসলে পেয়েছে ৩০ নম্বর। গত মাসে তন্দ্রাকে নতুন মার্কশিট তুলে দিয়েছে পর্ষদ। সভাপতির কথায়, 'গোটা ঘটনা দুঃখজনক, শিক্ষক সমাজের কাছে লজ্জাজনক। এরকম ঘটা একজন শিক্ষক হয়ে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কেন উনি এই কাজ করলেন তা আমরা বুঝতেও পেরেছি। তবে ওনার উত্তর পাওয়ার পরই তা বলব। ৩১ জুলাই তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।'

স্বচ্ছশিলাদেবীর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় তিনি নেই। কিন্তু গোটা ঘটনা সত্যি বলে তাঁর তরফে জানানো হয়েছে।

এই কপিটি যোগ্য সাব-এডিটরের হাতে পড়েছিল কিনা তা জানা যাচ্ছে না। আমরা ধরে নিচ্ছি তা পড়েনি। পড়লে কপিটি অবশ্যই নতুন করে লেখা হত।

যোগ্য সাব-এডিটর খবরের প্রথম বাক্যটি সবার আগে কেটে দিতেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্য দুটিরও ছুটি নেবার কথা। তিনি খবরটি নতুন করে লিখলে তা এই রকম হতে পারত—

ছাত্রীর খাতা লোপাট, তদন্তে পর্ষদ

২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক ছাত্রীর ইংরেজির খাতা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তদন্ত করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষকের জবাব পাওয়ার পর তা বিবেচনা করা হবে।

পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, বারাসাত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বচ্ছশিলাবসু এক দফা খাতা পরীক্ষা করেন। খাতাগুলি ফেরত পাবার পর প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষ কুমার দাস জানান, তিনি একটি খাতা পাননি। স্বচ্ছশিলা দেবী দাবি করেন, তিনি সব খাতা ফেরত দিয়েছেন।

এই বিরোধ পর্ষদে পৌঁছলে খোঁজখবর শুরু হয়। অবশেষে জানা যায় ছাত্রীটি ইংরেজিতে ৩০ নম্বর পেয়েছে। তখন তাকে নতুন মার্কশিট দেওয়া হয়েছে।

এমন ঘটনা কি ভাবে ঘটল এবং এর জন্য কে দায়ী তা নিয়ে পর্ষদ তদন্ত করছে। এই ব্যাপারে প্রধান পরীক্ষক কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে স্বচ্ছশিলা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

সাব-এডিটরের হাতে রিপোর্টারের লেখা খবরটির এই পরিবর্তিত রূপ দেখে তিনি খুশি হবেন কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ বিষয়। সাব-এডিটরের দ্বারা পুনর্লিখিত কপিটি চিফ সাব আরও ছোট করে দিতে পারেন। শেষ অনুচ্ছেদটি তিনি অনায়াসে বাদ দিতে পারেন। কারণ প্রথম অনুচ্ছেদেই তদন্তের ইঙ্গিত রয়েছে। খবরে পুনরাবৃত্তি সব সময় বর্জনীয়।

মূল খবরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যগুলি ছেঁটে ফেলে বাদ দেওয়ার কারণ হল, বক্তব্যের বিষয়বস্তু রিপোর্টারের নিজস্ব মন্তব্য, একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট। লেখার মধ্যে দিয়ে বিনা প্রমাণে পরীক্ষককে বাঁচাতে প্রধান পরীক্ষককে খলনায়ক সাজানো হয়েছে। রিপোর্টে এই সব কেরামতি চলে না। তা সব সময় বর্জনীয়। সেই অপ্রীতিকর কাজটি করতে হয় সাব-এডিটরকে। তা না করলে সাব-এডিটর দোষী হবেন।

রিপোর্টারের অজ্ঞতা এবং সাব-এডিটরের অসতর্কতায় শব্দ প্রয়োগে ভুলের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 'খ' কাগজে ২-৮-২০০২ তারিখে এই খবরটি বেরিয়েছিল—

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : অতিরিক্ত পণের টাকার দাবিতে বিয়ের তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেলুড়ের এক যুবককে শুক্রবার সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল হাওড়া জেলার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা আদালত।

রিপোর্টারের দেওয়া এই কপি পড়ে সাব-এডিটরের বোঝা উচিত ছিল তথ্যে মারাত্মক ভুল আছে। রিপোর্টারকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে সাব-এডিটরের বলা উচিত ছিল, "কিসসু হয়নি। কপি ঠিক করে দিন। একটা সামান্য ব্যাপারও যদি না জানেন তাহলে রিপোর্টার হন কেন? যান, কপি নতুন করে লিখে আনুন।"

সন্দেহ নেই, সাব-এডিটরের কথাগুলি খুবই কড়া। কিন্তু, কথাগুলি সবই ঠিক। আপনি বুঝতে পারছেন ভুলটা কী?

আমি আপনাকে সাহায্য করছি। দেখুন, কপিতে লেখা হয়েছে, আদালত সাজা দিয়েছে, "স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে"।

ভুলটা এখানেই হয়েছে। আদালত কোন অভিযোগে কাউকে কখনও সাজা দেয় না, দিতে পারে না। আইন সে অধিকার কাউকে দেয়নি। কোন ব্যক্তির নামে কোন অভিযোগ থাকতেই পারে। তা নিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলাও হতে পারে। সেই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতেও পারে। আদালত স্বাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে অভিযুক্তকে সসম্মানে মুক্তি দিতে পারে। আর, বিচার করে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যই অপরাধী তাহলে আদালত তাকে সাজা দেবে।

এই রিপোর্টে সে কথাই লিখতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশত রিপোর্টার 'অপরাধে' না লিখে 'অভিযোগে' লিখে কাজ সেরেছেন। এই অপরাধেই তাকে অতগুলি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন সাব-এডিটর। তা করে তিনি ঠিকই করেছেন। আর এই রকম ঘটনা ঘটে বলে সাব-এডিটরদের সঙ্গে রিপোর্টারদের বনিবনা হয় না।

এবার আপনি নিচের খবরটি পড়ুন। খবরটি ৩১-৮-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে—

লিয়েন্ডারের সঙ্গিনী মার্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : বছর তিনেক আগে গ্র্যান্ড স্লামে লি-হেশ জুটির দাপট দেখে তিনি দ্বিতীয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন সে বারের উইম্বলডন মিক্সড ডাবলসে তাঁর সঙ্গী হিসাবে। এ বার তিনি, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মিক্সড ডাবলসে নামছেন বাঙ্গালোরের পরিবর্তে কলকাতার ছেলেকে নিয়ে।

লিয়েন্ডার পেজ-নাভ্রাতিলোভা জুটি ভারতীয় সময় শনিবার ভোরে প্রথম রাউন্ডে খেলবেন শীর্ষ বাছাই অস্ট্রেলীয় জুটি টড উডব্রিজ-রেনে স্টাবের বিরুদ্ধে। চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও তিনি নাভ্রাতিলোভা বলেই এই ম্যাচ সংগঠকরা রেখেছেন ফ্লাশিং-মিডোর ঐতিহ্যময় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে। মিক্সড ডাবলসের ক্ষেত্রে যা সচরাচর ঘটে না।

নিউইয়র্কে যোগাযোগ করে অবশ্য জানা যাচ্ছে, মেয়েদের টেনিসের কিংবদন্তী খেলোয়াড় যেমন মহেশের ফর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে পার্টনার বেছেছিলেন, লিয়েন্ডারের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য তার ঠিক উল্টো। এ টি পি ট্যুর ডাবলসে লিয়েন্ডারের ফর্ম ইদানীং খারাপ যাওয়ায় গ্র্যান্ড স্লাম মিক্সড ডাবলসে তাঁর নিয়মিত পার্টনার লিজা রেমন্ড এ বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মাইক ব্রায়ানকে নিয়ে খেলছেন। তাঁর ও লিজার জুটির এই মুহূর্তে বাছাইয়ের মর্যাদা পাওয়া কঠিন হবে বলে প্রাক্তন উইম্বলডন জুটি পেশাদারি কারণেই ফ্লাশিং মিডোতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। লিজা-মাইক জুটি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে দ্বিতীয় বাছাই। কিন্তু লিয়েন্ডারও এমন একজনকে কোর্টে সঙ্গিনী পাচ্ছেন, যাঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ ঘটায় মহেশ একদা বলেছিলেন, "নাভ্রাতিলোভার পাশে খেলার অভিজ্ঞতা আমার টেনিসজীবনের অন্যতম সেরা সম্পদ হয়ে থাকল।" তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, বছর তিনেক আগে উইম্বলডনে নাভ্রাতিলোভার প্রথম পছন্দ ছিলেন নাকি লিয়েন্ডারই। কিন্তু সে বার লিজাকে আগেই কথা দিয়ে ফেলায় লি-র পক্ষে মার্টিনার সঙ্গী হওয়া সম্ভব হয়নি।

কোন দক্ষ সাব-এডিটর এইভাবে কপিটি ছাড়তেন না। কারণ এর মুখবন্ধ নিয়ম মেনে লেখা হয়নি। তাই তিনি প্রথমেই মুখবন্ধটি ছাঁটাই করে দিতেন। কপিটি নতুন করে লিখলে তা এইরকম দাঁড়াতে পারত—

মার্টিনার জুটি লিয়েন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের মিক্সড ডাবলসে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার জুটি হচ্ছেন লিয়েন্ডার পেজ। শনিবার ভোরে মার্টিনা-লি জুটির প্রথম রাউন্ডের লড়াই শীর্ষ বাছাই অস্ট্রেলীয় জুটি টড উডব্রিজ-রেনে স্টাবের সঙ্গে।

তিন বছর আগেই আন্তর্জাতিক টেনিসের কোর্টে এই ভারত-মার্কিন যুগলবন্দী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে বার লি আগেই লিজা রেমন্ডের জুটি হবেন বলে কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তখন লি-র পক্ষে মার্টিনার জুটি হওয়া সম্ভব হয়নি।

এ বার তা সম্ভব হওয়ায় টেনিসপ্রেমীরা একটি ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখার আশায় উদগ্রীব হয়ে আছেন।

একই খবর 'ঝ' কাগজে কত চমৎকারভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা দেখুন—

Paes teams up with Navratilova

Leander Paes will team up with Martina Navratilova of USA in the mixed doubles. The Indo-American due will open against Rennae Stubbs and Todd Woodbridge of Australia. Mahesh Bhupati and Elena Likhovtseva of Russia will play against the pair of Iroda Tulyaganova of the Uzbekistan and Cyril Suk of Czech Republic.

Agencies

একই বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি খবর দুটি কাগজে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনামূলক বিচার করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন সুসম্পাদনা কাকে বলে। দক্ষ ও যোগ্য সাব-এডিটরই বা কাকে বলা যায়। আমার মতে, ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত খবরটি নিশ্চিতভাবেই সুসম্পাদিত।

সাব-এডিটরের কাজ কপি ঠিক করা। কাগজের পাতার সংখ্যা ও প্রকাশের সময়ের ওপর সেই কাগজে কতজন সাব-এডিটর দরকার তা নির্ভর করে। একটি Tabloid — ট্যাবলয়েড মাপের সান্ধ্য দৈনিকের পক্ষে চার পাঁচজন সাব-এডিটরে কাজ চালান যায়।

একটি ছয় পাতার Broadsheet — ব্রডশিট প্রভাতী দৈনিক পাঁচ ছ'জন সাব-এডিটর দরকার হয়। এই হিসাবে আট দশ বা বারো পাতার পুরো মাপের প্রভাতী দৈনিকে প্রত্যেক শিফটে গড়ে আট থেকে দশ জন সাব-এডিটর নিযুক্ত করতে হয়।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজ যথা আনন্দবাজার পত্রিকা, নবভারত টাইমস (হিন্দী), তান্থি (তামিল), ইনাড়ু (তেলেগু), মালয়ালা মনোরামা (মালয়ালাম) প্রভৃতি কাগজের সাব-এডিটরদের একটা কাজ সংবাদ সংস্থার পাঠান কপি তরজমা করা। আর একটা কাজ রিপোর্টারদের কপির বিষয়বস্তুর ভুল ঠিক করে দেওয়া।

তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়, নাম, স্থান, সংখ্যা যাতে নির্ভুল হয়। বাক্যগঠন ও বানান নির্ভুল করাও তাঁর কাজ। বেআইনি কোন বিষয় লেখা হল কিনা তা লক্ষ্য রাখাও তাঁর কর্তব্য।

এই সব দায়িত্ব সামলাবার পর তিনি শিরোনাম লিখে তা কি মাপে ও কোন টাইপে ছাপা হবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেবেন। হাই-টেক যুগে অবশ্য এই পদ্ধতি অচল হয়ে গেছে। এখন মাপ ও টাইপের ব্যাপারটা ছাপাখানায় পাঠাবার দরকার হয়না। সাব-এডিটররাই নিজ নিজ কম্পিউটারে এই কাজ সম্পন্ন করেন। যে খবরের কাগজে সেই সুযোগ নেই সেখানে অবশ্য সম্পাদিত কপি কম্পিউটার রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে সাব-এডিটরদের কাজ সারতে হয়। তা না হলে কাগজ ছাপায় দেরি হয়ে বন্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে রিপোর্টারদের কপি বারবার নানাভাবে পরীক্ষা করা সাব-এডিটরদের বড় দায়িত্ব। তা না হলে রামের জীবনাবসান হলে সেই খবরের সঙ্গে শ্যামের ছবি ছাপা হওয়ার মত কেলেঙ্কারি ঘটা অসম্ভব নয়। কিম্বা নবনির্বাচিত সাংসদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রাভিনেত্রীকে সংসদের স্ত্রী বলে ক্যাপশন লেখার গলদও ঘটে যেতে পারে। বাস্তবে, সিপিআইএম নেতা পি রামমূর্তির মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে ওই পার্টির এক জীবিত নেতার ছবি ছেপেছিল কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিক। কর্নাটক থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভা

সাংসদ বিজয় মালিয়ার ছবিতে দৃশ্যমান এক মহিলাকে তাঁর স্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। ঐ মহিলা আসলে ছিলেন এক চিত্রাভিনেত্রী।

সাব-এডিটরদের এই রকম গাফিলতির জন্য সম্পাদককে কাগজের পরের সংখ্যায় ভুল সংশোধন ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

৫.২.১০ প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা

প্রথমেই জানাই, এই বইয়ে আমরা এরপর থেকে প্রতিবেদক কথাটি ব্যবহার না করে তাঁকে রিপোর্টার বলেই উল্লেখ করব।

১.২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "Reporter means a person who gathers and presents news at a particular centre"— অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে খবর যোগাড় করেন এবং প্রদান করেন তিনি রিপোর্টার।

এখন শব্দগত অর্থে রিপোর্টারের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা গেল। লক্ষ্য করলে দেখবেন রিপোর্টার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে কাজ করেন। তাঁর কাজ খবর যোগাড় করা এবং সংগ্রহ করে খবর ছাপার যোগ্য করে লিখে ফেলা।

এক্ষেত্রে বিশেষ কেন্দ্রটি হল কাগজটির প্রকাশনাস্থল। ধরুন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'ক' নামে একটি খবরের কাগজ। সেই অফিসে যুক্ত থেকে যাঁরা খবর যোগাড় ও যোগান দেবার কাজ করেন তাঁরা সেই কাগজের রিপোর্টার।

তাঁরা কী করেন? খবর যোগাড় করে, লিখে, যোগান দেন। আপনারা দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পর্যায়ের (Module) ১ এককে খবর কাকে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নিয়েছেন। সুতরাং আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি না। আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, রিপোর্টারকে সব সময় মনে রাখতে হয়, "খবরের কাগজ কী, খবর কী?"

সেই সঙ্গে আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, খবরের একটি সংজ্ঞা হল, "News is something which actually happened and which we learn about for the first time." — যা বাস্তবে ঘটেছে সে বিষয়ে প্রথম জানতে পারাই খবর। বিষয়টি কোন দুর্ঘটনা হতে পারে, কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য, বিবৃতি, ঘোষণা, সিদ্ধান্ত, অভিযোগ, প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রিপোর্টার এই ধরনের বিষয়ের বিবরণ যোগাড় করে তা চটপট লিখে ফেলে চিফ রিপোর্টারের হাতে দেন।

বাস্তবে আমাদের চার পাশে, জগৎ সংসারে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু ঘটে চলেছে, অনেকে অনেক কথা বলে চলেছেন। তার সবই কিন্তু খবর বলে গণ্য হয় না। তার মধ্যে শুধু যেগুলি জানার জন্য কিছু মানুষের, অনেক মানুষের, বহু মানুষের কৌতূহল এবং আগ্রহ আছে সেগুলি খবর বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের বিষয়গুলি চিনে নেবার মত চোখ, কান ও নাক থাকলে তবেই একজন পাকা রিপোর্টার হওয়া যায়। একে বলে খবর চেনার জ্ঞান বা News sense।

রিপোর্টারকে একরকম খবর নিয়ে যেতে থাকলে চলে না। তার কাছে খবরের রকমফের আছে —

প্রত্যাশিত খবর এবং অপ্রত্যাশিত খবর। কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে সভা হবে, মিছিল হবে, ধরনা হবে, অবরোধ হবে, সাংবাদিক সম্মেলন হবে, পরীক্ষার ফল ঘোষণা হবে, পরীক্ষা নেওয়া হবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহরে আসবেন, তিনি কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এই রকম অনেক কিছু ঘটনার খবর রিপোর্টার যোগাড় করেন ও লেখেন। এর মধ্যে সবগুলির প্রত্যাশিত খবরের পর্যায়ে পড়ে।

এর বাইরে যা যা ঘটে সে সব অপ্রত্যাশিত খবরের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা, মৃত্যু ইত্যাদি। আগে থেকে বলে কয়ে কোথাও আগুন লাগে? লাগে না। আগে থেকে জানান দিয়ে দুটি গাড়িতে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে? লাগে না। আগে থেকে ঘোষণা করে কেন বিশিষ্ট বা অতিবিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়? হয় না। এর সবকিছুই ঘটে যায় হঠাৎ। সেই জন্যই এগুলি অপ্রত্যাশিত খবর।

অপ্রত্যাশিত খবরের গুরুত্ব, বলা ভাল চমক, প্রত্যাশিত খবরের তুলনায় বেশি। সুতরাং এইরকম খবরের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক বেশি করে জানতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটাবার দায়িত্ব রিপোর্টারের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

আবার প্রত্যাশিত ঘটনাও অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নিতে পারে। প্রত্যাশিত ঘটনার ঝড় তোলা অপ্রত্যাশিত পরিণতিও সময় সময় ঘটে যায়। তার মধ্যে তো কোন কোন প্রত্যাশিত ঘটনার অপ্রত্যাশিত পরিণতি দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেয়। যেমন ধরুন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারির শীতার্ত অপরাহ্নে যে সব রিপোর্টার দিল্লিতে গান্ধীজির প্রার্থনা সভার খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কি জানতেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে নাথুরাম গড়সে নামে এক আর এস এস স্বেচ্ছসেবকের পিস্তলের গুলিতে কি ঘটতে যাচ্ছে?

১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর দ্বিপ্রহরে যে সব সাংবাদিক ডালাস শহরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন ফিৎজেরল্ড কেনেডির সরকারি সফর রিপোর্ট করেছিলেন তাঁরা কি কেউ জানতেন লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামে এক প্রাক্তন নৌসেনার টেলিস্কোপিক রাইফেল থেকে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুদূত কোন লক্ষ্যকে বিদীর্ণ করতে যাচ্ছে?

১৯৭২ সালের ১৭ জুন তারিখের ওয়াশিংটন পোস্টের ম্যানেজিং এডিটর হাওয়ার্ড সাইমনসের ঘুম ভাঙাল টেলিফোনের ঝনঝন শব্দ। তিনি তখন কি বুঝেছিলেন এই ঘণ্টাধ্বনিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের ক্ষমতার মৃত্যুঘণ্টা বাজছে? তখন তিনি শুধু জেনেছিলেন, ওয়াটারগেট আবাসনে ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী দফতরে রাত আড়াইটায় সিঁধ কেটে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। পাঁচজন চোর ধরাও পড়েছে। এই সিঁধেল চুরির ঘটনার পিছু ধাওয়া করে পোস্টের কয়েকজন রিপোর্টার ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করে নিক্সনকে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিলেন।

১৯৯১ সালের ২১ মে মধ্যরাতে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুর গ্রামে রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী সভার খবর যে সব রিপোর্টার কভার করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন ধানু নামে এল টি টি ই'র এক মানবী বোমা আর কয়েক মুহূর্ত পরে কি মহা সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে?

প্রত্যাশিত ঘটনা কি ভাবে কোন আগাম আভাস না দিয়ে আচমকা অপ্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় সে সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা দেবার জন্য ঐ তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

রিপোর্টারদের মধ্যে কয়েকজন রুটিন অনুযায়ী অফিসে বসে থাকেন। বাকিরা বেরিয়ে পড়েন যে যা নির্দিষ্ট কাজে। যারা অফিসে থাকেন তাঁরা শুধুই আড্ডা মেরে কালক্ষেপ করেন না। ফোনের পর ফোন করে

নানা সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কোন সূত্র থেকে কোন খবরের আঁচ পেলেই সেখানে ছুটে যান। কাজের সময় রিপোর্টারদের হাঁটলে চলে না, ছুটতে হয়।

খবর যোগাড় করতে যে সব রিপোর্টার বাইরে যান তাঁরা কাজ মিটলেই অফিসে ফিরে আসেন। সাধারণত সন্ধ্যার মধ্যে তাঁরা অফিসে ঢুকে পড়েন। ওপরওলারাও দেরি না করে রিপোর্টারদের কাছ থেকে খবরর রূপরেখা জেনে নেন। সেই পর্ব মিটলে রিপোর্টাররা যে যার খবর লিখতে বসে পড়েন।

শুধু ভাল খবর যোগাড় করেই রিপোর্টারের কাজ শেষ হয় না। তা ভালভাবে লেখার বিদ্যাও তাঁর থাকা দরকার। ১৫-৫-২০০ তারিখে 'খ' কাগজে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি দেখুন—

হেদুয়ার সুইমিং পুলে কিশোরী সাঁতারুর ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মঙ্গলবার সকালে উত্তর কলকাতার হেদুয়ার (আজাদ হিন্দ বাগ) সুইমিং পুলে এক কিশোরী সাঁতারুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। পূজা জালান (১৫) নামে নবম শ্রেণীর ওই ছাত্রী গত চার বছর ধরে ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা। সে প্রতিদিন হেদুয়ায় সাঁতার কাটত। এদিনও ভোর ৫টা নাগাদ পূজা তার তিন বোনকে নিয়ে জলে নামে। ৬টা সময় তিন বোন জল থেকে উঠে পড়লেও সে ওঠেনি। এরপর খোঁজা-খুঁজি শুরু হয়। অ্যাসোসিয়েশনের টেনাররা ব্যর্থ হলে কুমোরটুলি থেকে ডুবুরিরা এসে বেলা ১০টা নাগাদ প্রায় ১৫ ফুট জলের তলা থেকে পূজার দেহ উদ্ধার করে।

হেদুয়ার সুইমিং পুলে এর আগে ক্লাব সদস্য কোনও পাকা সাঁতারুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়নি। শহরে অন্যান্য সুইমিং পুলেও এই ধরনের ঘটনার কথা বিশেষ শোনা যায়নি। ফলে এই ঘটনাকে নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে সব ছোট ছেলে মেয়ে হেদুয়ায় সাঁতার শিখতে যায়, তাদের অভিভাবকরা এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরের সামনে কিছু অভিভাবক এদিক বিকালে কার্যত বিক্ষোভ দেখান। হেদুয়ার তিনটি সাঁতার ক্লাবই এদিন সাঁতার বন্ধ রাখে।

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাসিন্দা পূজা ৯৯ সালে প্রশিক্ষণ শেষ করে সাঁতারুর স্বীকৃতি পায়। তার এই মৃত্যুকে ঘিরে নানান অভিযোগ উঠেছে। বাড়ির লোকের অভিযোগ, সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের অবহেলার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। সাঁতার কাটার সময় টেনার ঠিকমতো নজর রাখেননি। ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সনৎ ঘোষ অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, সম্ভবত জলের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পূজার মৃত্যু হয়েছে। সুরেশবাবু অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ডি সি ডি ডি (১) সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস দায়ের করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপের তদন্ত হবে। পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদেরও জেরা করেছে।

পূজার বাড়ির লোকের অভিযোগ, পুল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়না। জলে কাদা-মাটি ও আগাছা আছে। তাতে আটকে মৃত্যু হতে পারে। পুলের তলায় কোনও জাল ছিল না। নিজস্ব ডুবুরি না থাকায় দেহ তুলতে দেরি হয়েছে। আগে তুললে হয়ত বাঁচানো যেত। তাঁদের আরও অভিযোগ, টেনার থাকলেও তাঁরা বিশেষ নজরদারি রাখেন না। সাঁতার শুরু ও শেষ করার সময় যে সই করানোর কথা তা করানো হয় না। সনৎবাবু অবশ্য এই সব বলেছেন, যারা সাঁতারু হয়ে যায়, টেনার তাদের ওপর নজর রাখের না। পুকুরের জল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তাই আগাছা বা কাদায় আটকে মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

ওপরের খবরটি একটি মোটামুটি আদর্শ রিপোর্ট বলে বিবেচনা করা যায়। শিরোনামেই স্পষ্ট 'কী' ঘটেছে। তারপর রয়েছে সংবাদের পরিভাষায় মুখবন্ধ। 'কবে', 'কখন', 'কোথায়' এবং 'কী' এই চারটি প্রশ্নের

জবাব মুখবন্ধের প্রথম বাক্যটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে নিহত কিশোরীটির বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে সে কত বছর ধরে সাঁতার কাটছে। এই দুটি প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাঁতার না-জানা একটি ছেলে বা মেয়ে জলে ডুবে মারা গেলে তাকে একটি দুর্ঘটনা বলে ধরা যেত। কিন্তু সাঁতার জানা একটি পনের বছর বয়সের মেয়ে জলে জুবে মারা গেলে সেটি নিছক দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যাবে না। তার সঙ্গে এক বা একাধিক ব্যক্তির কর্তব্যে অবহেলার প্রসঙ্গও এসে যাবে। খবরে জানানো হয়েছে, এ ক্ষেত্রে মৃত কিশোরীর বাড়ির লোকেরা সেই অভিযোগই করেছেন।

এখানেই খবরটি শেষ হয়নি। তা হলে খবরটি অসম্পূর্ণ হত। ফলে খবরের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হত। তা যাতে না হয় তার জন্য খবরে অভিযুক্তদের বক্তব্যকেও স্থান দেওয়া অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে রিপোর্টার দক্ষতা, সততা ও সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই খবরে জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সম্পাদক কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তাহলে সম্পাদকের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়, ১৯৯৯ সালে পাকা সাঁতারুর স্বীকৃতি পাওয়া এক কিশোরীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কী? সম্পাদক জবাব দিয়েছেন, সম্ভবত হঠাৎ অসুস্থতা এই মৃত্যুর কারণ। তাঁর দাবি, "পুকুরের জল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তাই আগাছা বা কাদায় আটকে মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না।"

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, পুলিশ কি সম্পাদকের এই কৈফিয়ৎ মেনে নেবে? সম্পাদকে একতরফা বয়ানের ভিত্তিতে পূজা জালানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর আর কোন তদন্ত কি হবে না?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে রিপোর্টার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বক্তব্য সংগ্রহ করে জেনেছেন ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপের তদন্ত হবে। ইতিমধ্যেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের জেরার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভও করে দিয়েছে পুলিশ।

এই রিপোর্ট লিখতে গিয়ে রিপোর্টার মোটামুটি চমৎকারভাবে ভাষার ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করুন, রিপোর্টকে সেনসেশ্যানাল বা চমকপ্রদ করার কোন চেষ্টা নেই। বিশেষণের ব্যবহার নেই। নিজস্ব মন্তব্যও কিছু নেই। এই রকম ভাষাই রিপোর্টের আদর্শ ভাষা।

ইংরেজি রঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা পি জি উডহাউস তাঁর 'থ্যাঙ্ক ইউ জীভস' উপন্যাসের এক জায়গায় (অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) কয়েক লাইনে এই ব্যাপারে যে আচরণবিধি বেঁধে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করার দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন, "বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষা যদি গুরুত্বসম্পন্ন না হয়, তাহলে প্রকাশের দৈন্য থেকে যায়।"

সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ছোট ছোট বাক্যে অলংকারহীন নিছক দরকারী তথ্য পরিবেশন করাই উত্তম সংবাদ লেখার চাবিকাঠি।

নিচে আমরা আর একটি রিপোর্ট অবিকল উদ্ধৃত করছি। ২৪-৩-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল। আপনি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন, রিপোর্টের মুখবন্ধটি নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে। বিশদ বিবরণে অবশ্য সামান্য সম্পাদনা করা দরকার ছিল। যথা— দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে 'স্বামীর' পর তার নাম লেখা দরকার ছিল। তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'ছেলের বৌ' লেখার বদলে পুত্রবধূ লেখা উচিত ছিল।

এন্টালিতে মা ও তিন শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

স্টার্ফ রিপোর্টার: শনিবার সকালে শিয়ালদহের কাছে একটি পরিবারের চার সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। চার জনের মধ্যে রয়েছে একটি এক বছরের ছেলে, তিন ও পাঁচ বছরের দুটি মেয়ে এবং তাদের মা। কলকাতা পুলিশের ডি সি (ই.সি ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রহস্যজনক এই মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। ঘটনাটি আত্মহত্যা না হত্যা, তাও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।

মাত্র মাস তিনেক আগেই এই গৃহবধূর স্বামী মারা যান। এদের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলই প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন। ঘটনার পর এই গৃহবধূর শ্বশুর ও শাশুড়ি বেপাত্তা। পুলিশ তাদের খুঁজছে। এদের বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলায়। শ্বশুর-শাশুড়িকে না পাওয়ায় এই গৃহবধূর এবং তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রের নামও বলতে পারেনি পুলিশ। দুটি মেয়ের নাম পুনম ও সোনম বলে জনা গিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকার শিবতলা লেনে। এই গলির ৬/১ নম্বরে ছোট ছোট ঘরে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বাস। তারই একটি ঘরে থাকেন কামেশ্বর সাউ (৬০)। শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে তাঁর সব্জির ব্যবসা। তিনি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী সুশীলা, ছেলের বৌ (২২) এবং তিন ছোট ছোট নাতি-নাতনি সেখানে থাকতেন। কলকাতাতেই বাবার সঙ্গে সব্জির ব্যবসা করতেন সুখ-বিন্দর। মাত্র মাস তিনেক আগে বিহারে গিয়ে তিনি মারা যান। প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন, সুখবিন্দর মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বিহার থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন কামেশ্বর। অনেকে বলেছেন, প্রায় ছ'বছর আগে সুখবিন্দরের বিয়ের পর থেকেই তাঁরা এখানে রয়েছেন। এ নিয়ে নিশ্চিত করে পুলিশও কিছু বলতে পারেনি।

এই দিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, কামেশ্বরের ঘরটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী প্রবীর দে জানিয়েছেন, ব্যবসার কাজে রোজ রাতে বেরিয়ে যান কামেশ্বর, ফেরেন পরদিন দুপুরে। শুক্রবার রাতেও কামেশ্বর কাজে বেরিয়ে যান। সকাল দশটায় তাঁর স্ত্রী সুশীলা তেল কিনতে বেরিয়ে যান। আধঘণ্টা বাদে তিনি ফিরে এসে বৌমা ও তিন নাতি-নাতনিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে লোক মারফত খবর পাঠান স্বামীর কাছে।

এবার কয়েকটি দুর্বল রিপোর্টের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ২১-৩-০২ তারিখে 'জ' কাগজে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর মেলার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। খবরে পাঠকদের জানান হয়েছিল, "বিশ্বমানের বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে এখানে।" রিপোর্ট পড়ে বোঝা গেল কী কোন কোন সামগ্রীর কথা বলা হচ্ছে? বোঝা গেল না। সেটা রিপোর্টের একটা দুর্বলতা। "পাওয়া যাবে" মানে কী? দেখতে পাওয়া যাবে? কিনতে পাওয়া যাবে? বোঝা গেল না। এটা রিপোর্টের আর একটা দুর্বলতা। সামগ্রীগুলি "বিশ্বমানের" এই সার্টিফিকেট কে দিল? রিপোর্টার? তাঁর সে বিদ্যা বা অধিকার আছে? প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ? তা হলে সে কথা পরিষ্কার করে না বলা রিপোর্টের আর একটি দুর্বলতা।

নিচে উদ্ধৃত রিপোর্টটিও দুর্বল রিপোর্টের আর একটি দৃষ্টান্ত—

বেপরোয়া গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার: বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে মোটরগাড়ী চালাইয়া লিণ্ডসে স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে কোন ফারমের হেড ড্রাফটসম্যান শ্রী ডি কে গ্যাডগিলকে চাপা দিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে রজব আলি নামক একজন মোটর ড্রাইভার পুলিশ প্রসিকিউটার শ্রীবীরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত বুধবার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জে এন মল্লিক তাহাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত হইতে হয়তো বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হইবে।

উদ্ধৃত রিপোর্টটি ১৬-৭-১৯৫২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টার এবং সাব-এডিটর দু'জনের কেউই লক্ষ্য করলেন না যে খবরের পশ্চাদপটটি সামনে চলে এসেছে এবং আশু ঘটনাটি তাকে অনুসরণ করছে। আজ কোন দক্ষ রিপোর্টার চলিত ভাষায় খবরটি লিখলে তা এই রকম দাঁড়াত—

স্টাফ রিপোর্টার: গাড়ি চাপা দিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার অপরাধে গাড়ির চালককে ছ'মাস কারাদণ্ড দিল আদালত। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট জে এন মল্লিক অপরাধী চালককে দু'শ টাকা জরিমানাও করেছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে অপরাধীর আরও তিন মাস কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে আদলত।

পুলিশ প্রসিকিউটার বীরকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪(ক) ধারায় রজব আলি নামে একজন মোটর ড্রাইভারকে আদালতে অভিযুক্ত করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছিল, বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে মোটরগাড়ি চালিয়ে ওই ব্যক্তি লিণ্ডসে স্ট্রিট ও চৌরঙ্গি রোডের মোড়ে এক ব্যক্তিকে চাপা দেয়। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বেসরকারি কর্মচারী ওই ব্যক্তির নাম বি কে গ্যাডগিল।"

রিপোর্টারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে তিনি নিজেই রিপোর্টটি এইভাবে লিখতেন। উল্টোভাবে লিখে সাব-এডিটরের কাজ বাড়াতেন না। সাংবাদিককে সব সময় মনে রাখতে হয় খবর লেখার কাজে শব্দ (Word) এবং সময় খুব দামি।

এবার আমরা 'সংবাদদাতা' নিয়ে আলোচনা করব। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদদাতা ও Correspondent সমার্থক শব্দ। বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদদাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Correspondent means a person who gathers and despatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication." — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রকাশনা কেন্দ্র ছাড়া অন্য যে কোন জায়গা থেকে খবর যোগাড় করে তা তারযোগে, ডাকযোগে বা অন্য কোন উপায়ে পাঠান তিনিই সংবাদদাতা।

বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা আর ঠিক এই রকম নেই। বরং অনেকটা বদলে গেছে। প্রথমেই বুঝে নিন, এখন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের ক্ষেত্রে যারা সেই রাজ্যের মফস্‌সল এলাকা থেকে প্রকাশনা কেন্দ্রে খবর পাঠান তাঁরা সংবাদদাতা বলে পরিচিত হন। তাঁরা প্রধানত জেলা সদরকে কেন্দ্র করে কাজ করেন। তাঁরা কেউই আর তারযোগে বা ডাকযোগে খবর পাঠান না। এখন খবর পাঠাবার প্রধান মাধ্যম টেলিফোন ও টেলিফ্যাক্স। তারও পরে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে e-mail এসে গেছে।

কিন্তু এ সব মাধ্যম ব্যবহার করা খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এসবের খরচ কাগজের কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হয়। আজ থেকে এদিক ওদিক ২০ বছর আগেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সব সংবাদদাতাই ছিলেন অবৈতনিক। লেখার প্যাড, কিছু খাম, কপি করে খবরের কাগজ এবং ডাকটিকিটের দামের বেশি আর কিছু তাঁদের দেওয়া হত না। তাতেই তাঁরা স্থানীয় এলাকার খবর পাঠিয়ে সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মত শহরে কর্তৃপক্ষ বেতন, ভাতা ইত্যাদি দিয়ে নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করতেন। এখন সে অবস্থা প্রতিযোগিতার চাপে অনেকটাই বদলে গেছে। কোন কোন কাগজ জেলা সদরগুলিতে পুরো সময়ের পেশাদার নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করছেন।

কোন পটভূমিতে সংবাদদাতা প্রথা চালু হয়েছিল তা আপনাদের সংক্ষেপে বলছি। পাঠকরা দেশ ও বিদেশের খবর পড়েই সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তাঁরা রাজ্যের নানা জায়গার খবর জানতে চাইতেন। পশ্চিমবঙ্গের খবর মানে তো শুধু কলকাতার খবর নয়। কলকাতার বাইরে যে পশ্চিমবঙ্গ ছড়িয়ে আছে তাও তো এই

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সুতরাং সেই সব এলাকার খবরও পাঠকরা তাঁর কাগজে পড়তে চান। তাঁদের সেই চাহিদার চাপেই সংবাদদাতা প্রথা চালু করতে হয়েছিল। সেই প্রথা উন্নত হতে হতে পুরো সময়ের নিজস্ব সংবাদদাতার রূপ নিয়েছে। তাঁদেরও স্টাফ রিপোর্টারের মতই খবর যোগাড় করে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রকাশনা কেন্দ্রে পাঠিতে দিতে হয়। সেই খবর ডেস্কে চলে যায়। সেখানে তা রিপোর্টারের কপির মতই সাব-এডিটরের সম্পাদনার পর ছাপাখানায় যায়।

সংবাদদাতাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছেন। নিচের কপিটি তাঁর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। খবরটি ২৮-৭-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল—

ফোর্ট উইলিয়াম কারখানা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ শনিবার সকালে কোন্নগরের ফোর্ট উইলিয়াম কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ওই কারখানার প্রায় সাড়ে চারশো শ্রমিক বেকার হলেন। এ দিন সকালের শিফটে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার গেটে শ্রমিকেরা সাসপেনশন অব অপারেশনের নোটিস দেখতে পান। যদিও কারখানা বন্ধ নিয়ে কোনও অশান্তি এ দিন হয়নি। মন্দার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ওই কারখানাটিতে অচলাবস্থা চলছিল। এর আগেও দড়ি ও তর তৈরির এই কারখানাটি দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস বন্ধ ছিল। মন্দা কাটাতে শ্রমিকদের বেতনের ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে কারখানার শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে চুক্তিও করেন। শ্রমিকেরা কারখানা বাঁচানোর স্বার্থে তা-ও মেনে নেন। শেষে কারখানাটি বন্ধই হয়ে গেল।

নিচের খবরটি তার উল্টো উদাহরণ। ওই 'ক' কাগজেই মঙ্গলবার ৩-৯-২০০২ তারিখে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল, "লাঞ্ছিত যুবকের আত্মহত্যার জেরে মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর"।

শিরোনামটি ঠিক আছে। কিন্তু নিজস্ব সংবাদদাতা খবরের মুখবন্ধে লিখেছেন, "এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে স্থানীয় একটি মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর চালাল জনতা।"

মুখবন্ধের এই বাক্যটি পড়ে আপনি 'কোথায়' এবং 'কবে' প্রশ্নের জবাব পেলেন? পেলেন না। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আপনাকে মুখবন্ধের দ্বিতীয় বাক্যটিতে পৌঁছতে হবে। সেখানে নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন, "রবিবার রাতে ঘটনাটা ঘটেছে বরাহনগরের ঝুলনতলায়"।

মুখবন্ধের দুটি বাক্যকে এক করা যায়। তা না করতে পারা নিজস্ব সংবাদদাতার অযোগ্যতা। এই অযোগ্যতা যে সাব-এডিটরের নজরে পড়ে না তিনিও তাঁর কর্তব্য পালনে গাফিলতি করলেন।

এবার দেখুন, বাক্য দুটিকে এক করে লিখলে তা কী রকম হয়— "রবিবার এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে অনেক রাতে বরাহনগরের ঝুলনতলায় একটি মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর চালায় জনতা।"

এই এক বাক্যের মুখবন্ধের মধ্যে দিয়ে কী কেন কবে কোথায় এবং কারা এই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। নিজস্ব সংবাদদাতার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকলে মুখবন্ধটি এ ভাবেই লিখতেন কি না তা আপনাদের ভেবে দেখতে বলি। প্রশিক্ষণের একটা বড় দিক ছোট ছোট বাক্যে, ছোট ছোট অনুচ্ছেদে, গুরুত্ব অনুযায়ী তথ্যগুলি পরপর সাজিয়ে, কোন বাড়তি কথা ব্যবহার না করে খবরটি লিখতে শেখা।

নিচের খবরটি তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। খবরটি ২০-৮-২০০২ তারিখে 'গ' কাগজে প্রকাশিত হয়ছিল—

Abu Nidal dies of gunshot wounds

Ramallah, Aug. 19 (Reuters): Palestinian guerrilla commander Abu Nidal, one of the world's most wanted men, was found dead from gunshot wounds in his Baghdad home, Palestinian sources said today.

A senior Palestinian official said Abu Nidal, 65, died under "mysterious conditions" and it was unclear whether he was killed or committed suicide. The account could not be independently verified.

Abu Nidal, a sworn enemy of Yasser Arafat and any Palestinian leader who sought accommodation with Israel, led a dissident Palestinian militant organisation high on Washington's list of groups it considered terrorist.

His Fatah Revolutionary Council group was blamed for attacks in 20 countries in which hundreds of people were killed or wounded, mostly during the 1970s and 1980s.

Abu Nidal was accused of masterminding gun and grenade attacks on Israeli and US airline check-in-desks, killing 19 people and injuring more than 100 in Rome and Vienna in December 1985. In his absence, an Italian court later sentenced him to life in prison for the Rome attack. His group was held responsible for an attack in June 1982 on Israel's ambassador in London, Shlomo Argov. The attack, which seriously wounded Argov, prompted Israel's invasion of Lebanon days later to root out Palestinian guerrilla groups.

Senior Palestinian sources said their contacts in Iraq had confirmed a report in the Palestinian *Al-Ayyam* newspaper which said today that Abu Nidal's body had been found with gunshot wounds and that he died three days ago.

Abu Nidal's brother, Mohammed al-Bana, said he knew nothing of his condition or whereabouts — but he had not spoken to Abu Nidal for about four decades.

"We heard the news (about his death) from the media. I haven't talked to him for a long time, 40 years or so. I spoke to friends and relatives in Arab countries to check this out, they didn't know he was in Baghdad," Mohammed al-Bana told Qatari satellite television station al Jazeera. Arab sources had said two years ago that Abu Nidal, suffering from an unidentified type of cancer, had moved to Baghdad for treatment.

Iraq has never commented on whether the guerrilla leader was in Baghdad. Abu Nidal, meaning "Father of the Struggle", was the nom de guerre of Sabri al-Bana, the head of the Fatah Revolutionary Council, which broke with the Palestine Liberation Organisation in 1974, saying it was too moderate.

"In the 1970s and 1980s, Abu Nidal was considered something of a bin Laden, a man of terror who had his hand in everything," veteran Israeli commentator Yossi Melman told Israeli army radio. Melman said Abu Nidal was believed to have worked "at the behest of many governments and intelligence agencies—Iraqi, Syrian, Libyan — and was especially active against the PLO and Arafat's senior entourage. He even tried to assassinate Arafat."

Born in the Mediterranean port town of Jaffa to wealthy Palestinian parents, Abu Nidal and his family were driven out to the West Bank during the 1948 West Asia War which accompanied Israel's creation.

খবরটির বিষয়বস্তু আবু নিদালের মৃত্যু। আবু নিদাল কে? প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে তার জবাব আছে। তিনি কীভাবে মারা গেলেন? দ্বিতীয় বাক্যে তার উত্তর আছে। তিনি কোথায় মারা গেলেন। তৃতীয় বাক্যটি মন দিয়ে পড়লেই তা জানতে পারবেন।

রামাল্লায় নিযুক্ত রয়টার্সের সংবাদদাতার সামনে আবু নিদালের মৃত্যু হয়েছে কি? না, হয়নি। তাহলে রয়টার্স কীভাবে নিদালের মৃত্যুর খবর জানল। এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে।

প্রকাশিত খবরের বাকি তথ্যগুলি গুরুত্বের দিক থেকে নিশ্চয় কম। কিন্তু ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন বিরোধের পটভূমিতে তা অপ্রয়োজনীয় নয়। সেই জন্যই নিদালের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে তা পাঠকদের আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। রয়টার্সের সংবাদদাতা সেই কর্তব্য সুষ্ঠুভাব পালন করেছেন। এর সঙ্গে তুলনা করে রবিবার ১৮-৮-২০০২ তারিশে 'ক' কাগজে ৮ কলম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরটি দেখুন—